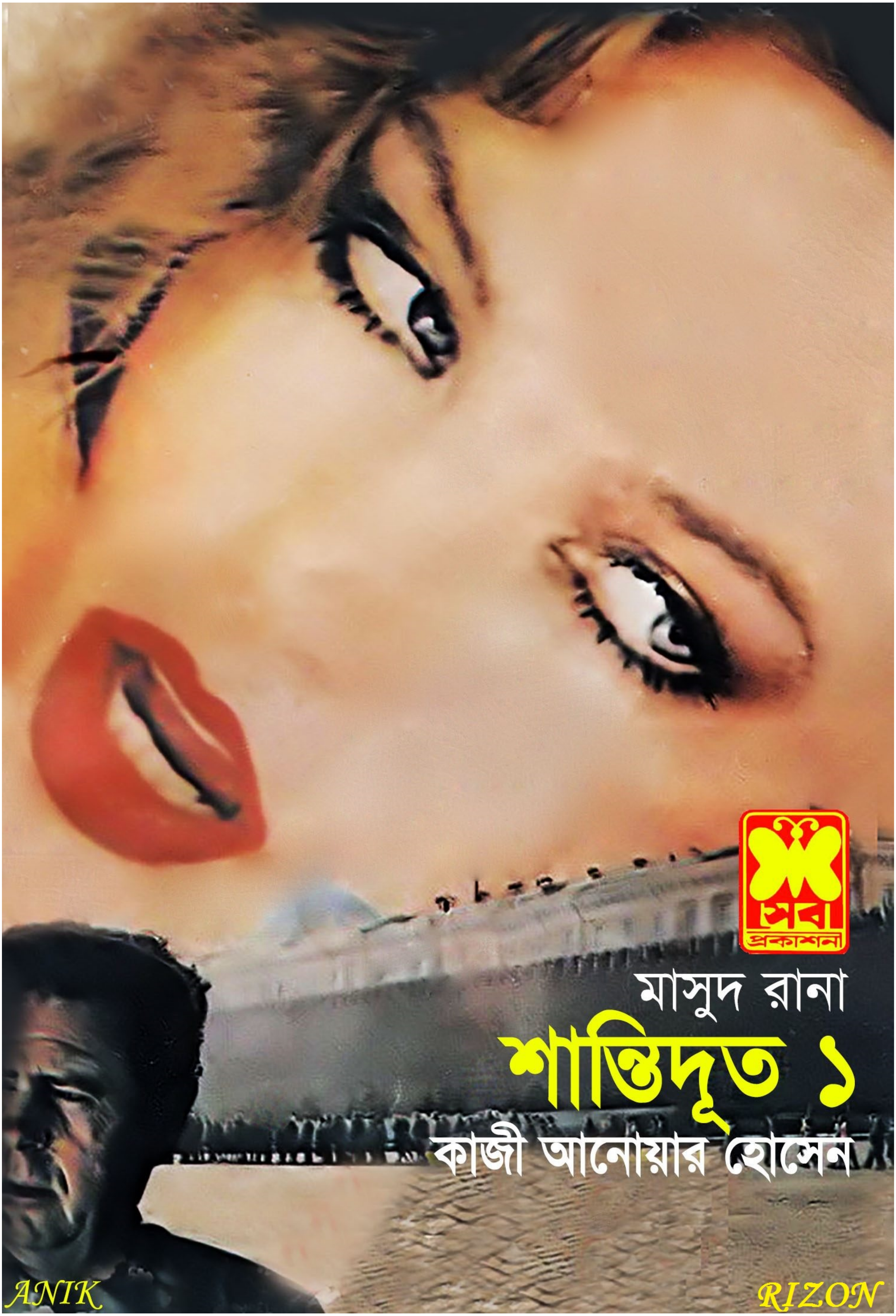
সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
শান্তিদূত ১
কাজী আনোয়ার হোসেন
ANIK
RIZON

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন
স্ক্যানের জন্যে বইটি দিয়েছেনঃ সিয়াম স্যাম

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১,২
রানা ! সাবধান ! ! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দুত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১,২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১,২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২
আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো, সোহানা-১,২
হাইজ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১,২,৩ * সাগর কন্যা-১,২
পালাবে কোথায়-১,২ * টার্গেট নাইন-১,২ * বিষ নিঃশ্বাস-১,২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যাঁমবুশ-১, ২ * আরেক বারমুডা-১,২
বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২ * রিপোর্টার-১,২
মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩ * স্পর্ধা-১,২
চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু-১, ২ * অগ্নিপুরুষ-১,২
অন্ধকারে চিতা-১, ২ * মরণকামড়-১, ২ * মরণখেলা-১,
অপহরণ-১, ২ * আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ * বিপর্যয়-১,

সেবা প্রকাশনী

শান্তিদূত-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও-বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১৪৯

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৭

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরাফত খান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা,
ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANTIDOOT-1
By Qazi Anwar Husain
Masud Rana-149

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি!
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

কেউ কিছু জানতে পারলো না। রাতের শেষ প্রহরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মানুষ—চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো বাড়িটাকে।

গাড়িগুলোকে দূরে রেখে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এলো ওরা। চারটে রাস্তায় ত্রিশ গজ পরপর একজন করে পজিশন নিলো। হাড় কাঁপানো শীত হলেও ক'দিন থেকে কুয়াশা খুব হালকাভাবে পড়ছে, তাই বিদ্যুৎ বিভাগকে আগেই অনুরোধ করা হয়েছিল— রাত ঠিক সাড়ে চারটের সময় রাস্তাগুলোর সব আলো নিভে গেছে। দু'পাশে দিয়াশলাই আকৃতির অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, কোথাও কোনো জানালা খোলা নেই। সাথে টর্চ থাকলেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ তা জ্বাললো না। কিছু কিছু শব্দও হলো, এড়ানো গেল না—কঠিন কংক্রিটের বুকে বুট জুতোর দ্রুত উত্থান আর পতন, ইউনিফর্মে সেলাই করা ধাতব বোতামের সাথে মেশিন পিস্তল আর অ্যাসল্ট রাইফেলের ঘষা, কমাণ্ডারের চাপা কণ্ঠের নির্দেশ।

গোর্কি স্ট্রীটের দুই মাথায় দুটো করে চারটে জীপ। বরিসভ স্ট্রীটের মাঝখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স। নস্টামকিন বুলেভার্ড—পাপেট

থিয়েটারের জন্যে বিখ্যাত—বেশিরভাগ গাড়ি এখানেই রাখা হয়েছে। যান্ত্রিক মই, কুণ্ডলী পাকানো রশি, রশির সিঁড়ি, ইত্যাদি সহ দমকল বাহিনীর গাড়িটা রয়েছে তাশিনেভো স্ট্রীটে।

বাড়িটার চারদিকে উঁচু-নিচু অনেক ছাদ, প্রায় সব ক'টায় উঠলো ওরা। কর্কশ মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে শুয়ে থাকলো, প্রত্যেকের সাথে রাইফেল। এরা সবাই স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র বিশেষ একটা ইউনিটের সদস্য, ইউনিফর্ম পরে আছে। অপারেশনটা কে. জি. বি.-র, সংখ্যায় তারাই বেশি—বত্রিশ জন। সবাই সিভিল ড্রেসে।

বাড়িটাকে ঘিরে থাকা সরু গলি আর রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো ওরা। ওভারকোটের নিচে স্টেচকিন মেশিন পিস্তল, ভাঁজ করা স্টক সহ কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, আর গ্যাস গান। প্রত্যেকেই ওরা নিপুণ লক্ষ্যভেদী। অভিজ্ঞ পেশাদার, নিজেদের কাজে ভারি দক্ষ, কর্নেল বিকারেন পছন্দ মতো বাছাই করে এনেছেন। এ-ধরনের জটিল অপারেশনে যাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন। কে. জি. বি.-র ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য অপারেশনটা সফল করা, সেই সাথে দেখতে হবে আবাসিক এলাকার নিরাপত্তা এবং শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। তাঁর বাছাই করা লোকেরা সবাই জানে, নিরীহ নাগরিকদের কোনো রকম অসুবিধে করা চলবে না।

কর্নেল বিকারেনের বয়স বাহান্ন, দেখে মনে হয় বিয়াল্লিশ। সমস্যার অকূল সাগরে যখন হাবুডুবু খান তখনো তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা লেগে থাকতে দেখা যায়। যে-কোনো সমস্যাকে তিনি গুরুত্বের সাথে নেন, কিন্তু উদ্বেগে ব্যাকুল হওয়া তাঁর স্বভাব নয়।

প্রায় ছ'ফিট লম্বা, শরীরে সামান্য মেদ আছে কি নেই, চোখে কৌতুক মেশানো বুদ্ধির ঝিলিক। রাস্তার ছ'পাশে আরেক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবাইকে দেখে নিলেন—যে যার পজিশনে দাঁড়িয়েছে। এ-ধরনের অপারেশনে তিনি নিজে বিশেষ একটা পজিশনে থাকতে পছন্দ করেন, ভাগ্যগুণে আজও সেটা জুটে গেছে। বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকে, আরেক বাড়ির টপ ফ্লোর। প্রাক্তন সৈনিক, উঁচু জায়গা থেকে যুদ্ধ করার অভ্যেসটা এখনো রয়ে গেছে।

চোখ থেকে বায়নোকিউলার নামালেন কর্নেল বিকারেন। হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, ছ'টা বাজতে চলেছে। সূর্য উঠলেও, অপ্রত্যাশিত কুয়াশার মোটা চাদর ফুঁড়ে রোদ নামতে পারছে না। সারাটা রাত জেগে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ডলে চোখের জ্বালা নেভাবার চেষ্টা করলেন তিনি। পাশে দাঁড়ানো কোঁকড়া চুল সহকারীকে বললেন, 'আর দেরি করা চলে না। স্কুলের সময় হয়ে আসছে, ছেলেমেয়েরা বেরুতে শুরু করবে।'

'তাহলে হুকুম দেই, কর্নেল কমরেড?' দীর্ঘদেহী দানব লোকটা, মানুষ বুঝে কারো সাথে বিনয়ের অবতার, কারো কাছে নিষ্ঠুর চণ্ডাল। ছটোই তার বাইরের চেহারা, ভেতরের মানুষটা কাজ পাগল এবং কর্মকর্তাদের হুকুম পালনে নিবেদিত প্রাণ। প্রায় সব অপারেশনেই তাকে সাথে রাখেন কর্নেল, কারণ ওর মতো ভালো-ভাবে আর কেউ তাঁর নির্দেশ বোঝে না।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল বিকারেন।

ওয়াকি-টকি অন করে মুখের সামনে তুললো লেফটেন্যান্ট কুরা-ডিন, নিচু গলায় কথা বললো, 'রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি।

রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি। ভেতরে ঢোকো। সব ক'টা রেড ড্রাগন ইউনিট এই মুহূর্তে ভেতরে ঢোকো।'

কর্নেল দেখলেন, এক শো এগারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এক জোড়া অ্যাসল্ট স্কোয়াড ঢুকে গেল। চোখের আড়ালে হারিয়ে গেলেও, লোকগুলো কি করছে পরিষ্কার কল্পনা করতে পারলেন তিনি। তিনজন সেলারে নেমে গিয়ে তল্লাশী চালাচ্ছে, দু'জন পাহারায় রয়েছে ক্ষুদে লবিতে, নয় জন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে—বারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামবে তারা। অন্য একটা টিম ইতিমধ্যে বাড়িটার পিছন দিকে পজিশন নিয়েছে, পালাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ।

'জ্যান্ত। লোকটাকে আমি জ্যান্ত চাই।'

'সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কর্নেল কমরেড,' প্রকাণ্ডদেহী লেফটেন্যান্ট বললো।

'ওর মা আছে ।' ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন কর্নেল বিকারেন।

'এবং অবিবাহিত বোন। কিন্তু আমরা জানি না তারাও এর সাথে জড়িত কিনা। আপনার নির্দেশ ওদের আমি জানিয়ে দিয়েছি—কেউ বাধা না দিলে কাউকে কিছু বলা চলবে না।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, বাড়িটার ভেতর থেকে পিস্তলের আওয়াজ হলো। মাত্র একবার।

লেফটেন্যান্ট কিছু বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামতে শুরু করলেন কর্নেল।

গোর্কি স্ট্রীট। রাস্তা পেরিয়ে এক শো এগারো নম্বর বাড়িটার দিকে ছুটলেন তিনি। আরো আওয়াজ হলো গুলির। নির্দেশ

দেয়ার সময় তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠলো। একেক বারে তিনটে করে ধাপ টপকে ওপরতালার দিকে ছুটলেন। তাঁকে অনুসরণ করলো আরো তিনজন কে. জি. বি. এজেন্ট। বারো নম্বর অ্যাপার্ট-মেন্টের দরজা ভাঙা হয়েছে, ফ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন কজা সহ দরজার কবাট কাত হয়ে আছে এক দিকে। দোরগোড়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একজন কে. জি. বি. করপোরাল, তার বেল্টের ওপর নাভির কাছে তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে শার্ট, ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে লোকটা।

'অ্যাম্বুলেন্স!' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের লোকদের বললেন কর্নেল, লাফ দিয়ে আহত করপোরালকে টপকে ঢুকে পড়লেন অ্যাপার্ট-মেন্টের ভেতর।

সুসজ্জিত কামরা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন কর্নেল। দেয়ালে লেনিন আর স্ট্যালিনের ছবি।

'এদিকে, কর্নেল কমরেড,' ভারি একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'বেঁচে আছে ও?'

বেডরুমের দোরগোড়া থেকে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ক্যাপটেন। তার মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। 'জ্বী, কর্নেল কমরেড। আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

উঁকি দিয়ে আগেই দেখেছেন কর্নেল, এবার সরাসরি খাটের তলায় তাকিয়ে মা আর মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, 'আপনাদের কোনো ভয় নেই। কেউ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আপনাদের কোনো ভয় নেই।'

বেডরুমে ঢুকলেন তিনি। মেঝের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা শরীর। যার জন্যে এতো আয়োজন, এই সেই লোক।

এক চুল নড়ছে না।

'ষোলো আনা বেঁচে আছে, কর্নেল কমরেড,' আশ্বস্ত করলো ক্যাপটেন। তার সঙ্গীরা জানালার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'পেটে শুধু হাঁটুর গুঁতো মেরেছি, ব্যাস।'

মেঝে থেকে গুঙিয়ে উঠলো লোকটা।

'অকৃতজ্ঞ ছেলের চেয়ে পেটে হাঁটুর গুতো কম ব্যথা দেয়, গ্রাম দেশের প্রবাদ, কর্নেল কমরেড,' তিনটে স্টেইনলেস স্টীলের দাঁত বের করে হাসলো ক্যাপটেন।

'প্রাণ বাঁচিয়েছো মানে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'নক করতেই গুলি করলো, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকে দেখি মা-বোনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। ফাঁকা আওয়াজ করলাম আমরা, মহিলারা খাটের তলায় লুকালো। বুড়ি মায়ের প্রশংসা করতে হয়, ছেলের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন।' নিজের ফুলে থাকা পকেটে চাপড় মারলো ক্যাপটেন। 'বেডরুমে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছিল ছোকরা, সেটা কেড়ে নিয়ে...।'

কর্নেলের চেহারায় বিরক্তির ভাব।

'পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারার আগে ওর পেটে মেশিন পিস্তল ঠেকিয়েছিলাম, কর্নেল কমরেড,' বললো ক্যাপটেন। 'মুখের ভেতর থেকে এই ক্যাপসুলটা বেরিয়ে এলো।' মুঠো খুললো ক্যাপটেন, তার ঘামে ভেজা তালুতে নীল একটা ক্যাপসুল দেখলেন কর্নেল। দেখেই চিনলেন—সায়ানাইড ক্যাপসুল, পেটে পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু হবার কথা। হাতে ওয়াকি-টকি নিয়ে বেডরুমে ঢুকলো লেফটেন্যান্ট কুরাডিন। ক্যাপসুলটা সে-ও দেখলো।

ব্রিটিশ, আমেরিকান, বা চাইনিজ নয়, ওটা রাশিয়ান সুইসাইড

ক্যাপসুল। কর্নেলের চেহারায় হতভম্ব ভাব, কারণটা বুঝতে পারলো কুরাভিন। কোথাও মারাত্মক কোনো ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছে।

এ-সব নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই এলিস থেলারের। প্রায় ছ'-হাজার মাইল দূরে রয়েছে সে, আমেরিকার ডেনভারে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দু'কামরার বাড়িটায় বসে আপনমনে চিনে বাদাম চিবোচ্ছে বেচারা, জীবনে কখনো স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র নাম পর্যন্ত শোনেনি। রাজনীতি সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই, স্পাই মুভি দেখে না, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। চিনে বাদামের সাথে বিয়ার পান করছে থেলার, অপেক্ষা করছে খবরের পর কখন নাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে টিভিতে। জানে না, প্রায় দেড় যুগ পর তার ভাগ্য তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠতে চাইছে।

দুই

এগারো নম্বর ক্রোপুতকিন স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়িটা সংস্কৃতিবান মস্কোবাসীদের জন্যে বিরাট এক আকর্ষণ। লেভ তলস্তয় মিউজিয়াম

ওটা। অমর কথাশিল্পীর স্বহস্তে লিখিত অ্যানা কারেনিনা, ওঅর অ্যাণ্ড পীস, ইত্যাদি যুগান্তকারী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রয়েছে ওখানে। দেশ-বিদেশের কতো শতো লোক ওগুলো দেখার জন্যে প্রতিদিন আসছে। কিন্তু মাত্র চারটে দরজা ছাড়িয়ে পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়িটায় কি ঘটছে কেউ তা জানে না। এক কালে ওটা জারের কোনো এক দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের লীলা-নিকেতন ছিলো। খিলান আকৃতির গেটে একটা সাইনবোর্ড লটকানো আছে—বোটানিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আসলে তাও নয়, বাড়িটা হলো কে. জি. বি.-র থার্ড ব্যুরো-র হেডকোয়ার্টার। আর থার্ড ব্যুরো মানেই হলো স্টেট সিকিউরিটি কমিটি।

পাথুরে বাড়িটার বেসমেন্টে ছয় হাজার পুরনো মদের বোতল রাখা হতো এক কালে। এই মুহূর্তে সেখানে একটা ইন্টারোগেশন টিম সুকৌশল এবং দক্ষতার সাথে বন্দী লোকটাকে কথা বলাবার চেষ্টা করছে। বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো নতুন কিছু নয়, সেই আদি যুগ থেকে চলে আসছে। বর্তমান যুগে এ-ব্যাপারে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে কমিউনিস্ট বা পুঁজিবাদী সরকার কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই, আর তৃতীয় বিশ্বের জগাখিচুড়ি মার্কা সরকারগুলো তো এক কাঠি বাড়া মাত্রা জ্ঞান না থাকায় বেশিরভাগ সময় বন্দীকে তারা মেরে ফেলে। কে. জি. বি.-র ইন্টারোগেশন সিস্টেম বরং সি. আই. এ. সিস্টেমের চেয়ে অনেক কম রোমহর্ষক। কে. জি. বি. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, নির্যাতনের মাত্রা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়। আকস্মিক নিষ্ঠুরতা সি. আই. এ. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, ফলাফল অনেক তাড়াতাড়ি আসে।

এপ্রিলের চমৎকার সন্ধ্যা, কুয়াশা কেটে গিয়ে থালা আকৃতির

চাঁদ উঠেছে আকাশে। পঞ্চাশ গজও দূরে নয়, সাজানো বাগান থেকে ভুর ভুর করে ফুলের গন্ধ ছুটছে, কিন্তু সুবাস নিয়ে বেসমেন্টে ঢোকার সুযোগ নেই হিমেল বাতাসের। সবুজ চামড়া মোড়া একটা আর্মচেয়ারে, দেয়াল ঘেঁষে বসে আছেন কর্নেল আনাতোলি বিকারেন। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, যেন আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। অথচ নির্যাতন তাঁর ওপর নয়, চলছে বন্দীর ওপর।

অহিংসা পরম ধর্ম নয় তাঁর, তবে স্বদেশী কারো ওপর নির্যাতনের নির্দেশ দিয়ে দারুণ মর্মপীড়ায় ভোগেন ভদ্রলোক। নির্যাতন এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন বন্দীকে, কিন্তু মুখ খুলতে রাজি হয়নি লোকটা। সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ব্যক্তিগত-ভাবে চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে ইন্টারোগেশন টিমকে ডেকে পাঠান। দু'ঘন্টা হলো দৈহিক নির্যাতন ভোগ করছে বন্দী, কিন্তু দুটো মাত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করেনি সে।

'ট্রুশেনকো! দিমিত্রি ট্রুশেনকো!' বারবার শুধু নামটা বলে চলেছে বন্দী।

'দিমিত্রি ট্রুশেনকো,' বললো লেফটেন্যান্ট নিকিতা কুরাডিন। বেসমেন্টে নয়, তিন তালার একটা অফিসে রয়েছে সে। ওয়াকি-টকির বদলে হাতে এখন মোটাসোটা একটা বাদামি এনভেলাপ। 'মানে বন্দীর আইডেনটিটি ডকুমেন্টে এই নামটাই রয়েছে,' ডেস্কের ওধারে বসা আরেক দানবকে বললো সে। নিকোলাই ডালচিমস্কি দাঁড়ালে মনে হবে ছয় ফিট লম্বা, চৌকো একটা দরজা। 'কিন্তু

আমাদের ধারণা, কাগজ-পত্র সবই ভুয়া। সেজন্যেই আমরা চাইছি আপনি সব চেক করে দেখুন একবার। কে. জি. বি. সেরা ডকুমেন্টস এক্সপার্ট বলতে আপনাকেই চেনে সবাই।'

এই সব জুনিয়র অফিসাররা 'আমরা' বলে কর্তৃপক্ষের সাথে নিজেদের এক করে দেখাতে চায়, ব্যাপারটা হাস্যকর—কিন্তু নিকোলাই ডালচিমস্কি হাসলো না। হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নেয়ার সময় এমন কি তার ঠোঁটের কোণ বা চোখের পাপড়ি পর্যন্ত এক চুল নড়লো না। তেইশ বছর কে. জি. বি.-তে চাকরি করছে, এ-ধরনের পরিস্থিতি তার জন্যে নতুন কিছু নয়। 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট,' সাবধানে বললো সে।

বিনয়ের অবতার সাজলো লেফটেন্যান্ট, 'প্রশংসা আপনার প্রাপ্য, মেজর কমরেড। আপনি অর্জন করেছেন। আর এই ব্যাপারটায় আমরা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছি। ইন্টারোগেশন শেষ হলে আমরা হয়তো সবটুকুই জানতে পারবো, কিন্তু শেষ হতে তিন কি চারদিন লাগবে। আমরা আশা করছি তার আগেই আপনি...,' অকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রশ্ন করলো লেফটেন্যান্ট, 'জানেন, হারামজাদার ফ্ল্যাটে কি পাওয়া গেছে?'

'ট্রান্সমিটার?'

'শুধু ওটা হলে তো কথাই ছিলো না,' গলা খাদে নামালো কুরাডিন। 'মেশিন-পিস্তল, রাইফেল, গ্রেনেড, বাজুকা, ডিনামাইট—তথ্যটা কিন্তু গোপনীয়, মেজর কমরেড।'

'কি বলেছো কিছুই আমি শুনতে পাইনি, লেফটেন্যান্ট।'

'আপনি খুব ভালো মানুষ, কমরেড!' আরেকবার বিনয়ের অবতার সাজলো লেফটেন্যান্ট।

এবার ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কি ঠোঁট টিপে একটু হাসলো। ভালোমানুষ ?

তিন তালায় কুরাডিনের পিছনে ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বেসমেন্টে আরেকটা দরজা বন্ধ হলো কর্নেল বিকারেনের পিছনে। ইন্টারোগেশন রুমের বাইরে ইউনিফর্ম পরা গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তার উদ্দেশে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোলেন তিনি, একটুর জন্যে জেনারেল লুদভিক কায়কোভস্কি-র সাথে ধাক্কা খেলেন না।

'তুমি হাসছো না, আনাতোলি !' কে. জি. বি. চীফ কৃত্রিম প্রতিবাদের সুরে বললেন। 'ব্যাপারটার সাথে আজও তুমি অভ্যস্ত হতে পারলে না। এই একটা সময় তোমার মুখে হাসি থাকে না।'

'আমি একজন সৈনিক ছিলাম, জেনারেল কমরেড,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'কাউকে নির্যাতন করা— আমার পৌরুষে বাধে। জানি, এরও প্রয়োজন আছে। কেউ কথা বলতে না চাইলে আর কোনো উপায় থাকে না।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'সবই বুঝি, কিন্তু তবু মেনে নিতে কষ্ট হয়।'

'আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, আনাতোলি। কেউ তোমার কাছে জবাবদিহিও চাইছে না।' জেনারেল কায়কোভস্কি হাসছেন। 'সিকিউরিটি-ফোরে আমিই তোমাকে এখানে এনেছিলাম, মনে আছে ? কে অস্বীকার করবে যে তার আগে তুমি একজন দক্ষ সৈনিক ছিলে ?'

'এবং কে অস্বীকার করবে আপনিও সেরা কমিশার-দের একজন ছিলেন ?' স্মরণ করলেন কর্নেল বিকারেন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রতিটি সোভিয়েত ব্যাটালিয়নে একজন করে পলিটি-

ক্যাল কমিশার থাকতো, নিজের ভূমিকায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'তোমাকে মেডেল দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলাম, সেজন্যে বলছো না তো?' করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন জেনারেল। রুশ-চীন সীমান্তে এক সময় একসাথে লড়েছেন ওঁরা, ছোটোখাটো সংঘর্ষে বড় ধরনের বীরত্ব দেখিয়েছিলেন কর্নেল বিকারেন।

'আপনি ভালো করেই জানেন মেডেলের প্রতি আমার মোহ নেই,' বললেন বিকারেন। 'তাছাড়া, আমার সৈনিক হওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত কারণটা ছিলো সর্বহারাদের জন্যে তৈরি করা আমাদের এই স্বর্গটাকে সাম্রাজ্যবাদী কসাইদের নিষ্ঠুর থাবা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আমি পাইনি···।'

'একটু ভুল হলো,' পক্ককেশ জেনারেল সকৌতুকে বললেন। 'আমেরিকার সাথে আমরা নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় বসছি। দু'-একটা চুক্তি হয়ে গেছে, আরো হবার পথে। তারমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু আরেক দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধ শুধু শুরুই হয়নি; তুমি নিজেও সে-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছো।' পরিবেশের মধ্যে নাটকীয়তা আনার জন্যে বিরতি নিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছেন কর্নেল, জেনারেল কায়কোভস্কির পাণ্ডিত্যের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা।

'যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে, এটা তো তোমারই কথা, কর্নেল কমরেড,' বললেন জেনারেল।' আর্মি, নেভি, বা এয়ারফোর্স নয়, এখন যুদ্ধ করছে স্পাইরা। কাজেই নিজেকে এখনো তুমি একজন সৈনিক

হিসেবে ভাবতে পারো, কারণ তুমি একজন স্পাই—আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো।' পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করলেন তিনি, ধরাবার জন্যে করিডরে থামলেন। 'ভালো কথা, ইন্টারোগেশন এগোচ্ছে কেমন ?'

বিকারেন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সত্যিকার ফ্যানাটিক লোকটা। সমস্ত টরচার নীরবে সহ্য করছে, নাম ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ওটাও আসল বলে মনে হয় না। ওর কাগজ-পত্র সব আমি চেক করতে পাঠিয়েছি।' জেনারেল হাত বাড়িয়ে দিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'ধন্যবাদ, জেনারেল কমরেড—আপনার চুরুটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।'

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, ভারি রোমান্টিক নাম—কিউবান, অবশ্যই। ভাবছি এখন থেকে এটাই খাবো।'

বিকারেন চুপ করে থাকলেন। তিনি ধূমপায়ী, এবং চুরুটই খান ; স্বীকারও করেন যে কিউবার কোনো কোনো চুরুট সত্যি ভালো, কিন্তু স্বদেশে তৈরি চুরুটের প্রতি তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। লিখিত রিপোর্ট এখনো তৈরি করা হয়নি, সকালের ঘটনাটা তাই এই সুযোগে জেনারেলকে জানিয়ে দিলেন তিনি। সুইসাইড ক্যাপসুল প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সবশেষে বললেন, 'অসন্তুষ্ট একজন কবি বা ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানী নয়—তা যদি হতো, মুখের ভেতর সুইসাইড ক্যাপসুল থাকতো না। আমার বিশ্বাস, লোকটা বড় ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। হয়তো আমাদের নিজে-দেরও কিছু লোককে তালিকায় পাওয়া যাবে। বোধহয় একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়া··· ।'

'কেঁচো খুঁড়তে সাপ ?'

'স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। নেহাতই ভাগ্য। পুলিশের ধারণা হয়েছিল, পাশের বিল্ডিঙে কোনো লোক ব্ল্যাকমার্কেট অপারেশনের সাথে জড়িত। একজন টেকনিশিয়ানকে পাঠায় ওরা, টেলিফোনের তারে আড়িপাতা যন্ত্র লাগাবে। লাগালো ঠিকই, কিন্তু অন্য এক নম্বরে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওঁরা। 'প্রথম এক হপ্তা কিছুই ঘটলো না। তারপর একদিন পরপর দু'বার মজার মজার কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। দু'বারই "দাগী আসামী" নামটা উচ্চারণ করা হয়।'

যেন পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'কি বলছো তুমি! মার্শাল লিউ ওনায়েভকে দাগী আসামী বলার মতো লোক খুব বেশি নেই। শুধু রেড আর্মি স্টাফ অফিসার-দের কেউ কেউ বলে থাকে··· ।'

'ব্যাপারটার সাথে রেড আর্মি স্টাফরাও জড়িত থাকতে পারে। যতো দুর জানি, জেনারেল স্টাফে স্ট্যালিন পন্থী একমাত্র ওনায়েভই রয়ে গেছেন এখনো। তবে আরো অনেকে থাকতে পারে, আমরা চিনি না। আশা করছি আমরা একটা তালিকা পাবো বন্দীর কাছ থেকে।'

চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'কমরেড জেনারেল, তাহলে আপনিই বলুন, ছাব্বিশ হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন, আঠারো বাক্স গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ, তিন জোড়া বাজুকা, আঠারোটা অটোমেটিক রাইফেল, নয়টা লেটেস্ট মডেল রেড আর্মি স্নাইপার রাইফেল নাইট স্কোপ সহ—কি কারণে একজন লোক তার ঘরে লুকিয়ে রাখতে পারে? আর্মেনিয়ান ফোক ফেস্টিভালের দিন আতসবাজি অনুষ্ঠানের জন্যে? নাকি বিয়ের দিন

ফূর্তি করার জন্যে ?'

এবার ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল। 'এ-সবের সাথে যদি মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া না গিয়ে থাকে··· ।'

'যায়নি ।'

ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুলেন ওঁরা, করিডর ধরে কর্নেল বিকারেনের অফিসের দিকে এগোলেন। কথায় এমন মশগুল হয়ে আছেন দু'-জন, পিছনে লেফটেন্যান্ট কুরাডিনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন না।

'তাহলে তো দিমিত্রি ট্রুশেনকোর ছাল-চামড়া তুলে হলেও সব কথা বের করে আনতে হবে,' জেনারেল কায়কোভস্কি প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন। 'ভুল হলো, আসলে বলতে চেয়েছি—হাড় গুঁড়ো করে হলেও।'

'হ্যাঁ, তাই,' অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সাথে বললেন কর্নেল।

'তুমি আমাকে বেঈমানদের তালিকা দাও, আমি ওদের ধ্বংস করি,' প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল। 'নাম, পরিচয়, ঠিকানা, অস্তিত্ব, ছায়া, প্রভাব—সব নিশ্চিহ্ন করে দেবো। কেউ জানবে না ওরা ছিলো।'

'সবচেয়ে আগে দরকার বন্দীর আসল পরিচয়··· ।'

'বন্দীর আসল পরিচয় সবচেয়ে আগে দরকার, কর্নেল বলেছেন,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করলো লেফটেন্যান্ট কুরাডিন, রাত দুটোর সময়। ল্যাবরেটরীতে ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কির সাথে আরো একজন রয়েছে—একটা মেয়ে। সন্ধ্যায় যে মেয়েটিকে দেখে ছিলো কুরাডিন, এটা তার চেয়েও সুন্দরী। ল্যাবরেটরীতে ডাল-

চিমস্কির সহকারিণীরা সবাই পার্ট টাইম ডিউটি করে। কাউকেই একটানা বেশিদিন রাখে না ডালচিমস্কি, কোনো না কোনো অজুহাতে হয় তারা নিজেরাই অন্য কোথাও চলে যায়, নয়তো ডালচিমস্কি তাদের বিদায় করে দেয়। ডালচিমস্কির বিরুদ্ধে মেয়ে সংক্রান্ত অনেক গুজব থাকলেও আজ পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। হয়তো যাদের অভিযোগ করার কারণ আছে তারা ডালচিমস্কির প্রভাবকে খাটো করে দেখতে সাহস পায় না। কিংবা তাদের নিজেদেরই এমন সব দুর্বলতা আছে যে সেগুলো ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে চুপ করে থাকাই ভালো মনে করে। কোনো কোনো মেয়েকে নাকি হাসপাতালেও যেতে হয়েছে।

'ওকে আর দিমিত্রি ট্রুশেনকো নামে ডাকার দরকার নেই,' বললো ডালচিমস্কি। 'কাগজ-পত্র সবই জাল। খুবই উঁচুদরের কাজ। সি. আই. এ. বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও এতো নিখুঁত জাল ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারবে না। কালি, কাগজ, সীল—সব প্রায় নিখুঁত। এই মুহূর্তে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারছি।'

নিষ্ঠুর চণ্ডালের মতো হিংস্র হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের চেহারা। 'ওকে আমরা ছিঁড়ে ফেলবো না! নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটা হয়, আমরা সেটা দিয়ে ওর মাংস তুলবো—একটু একটু করে। আরো একদিন, বড় জোর দু'দিন—পাখির মতো কিচিরমিচির শুরু করবে বাছাধন!'

ডালচিমস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দূরে বসা সহকারিণীর দিকে তাকালো। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা। কিন্তু ডালচিমস্কি তাকাতেই ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিলো সে। ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি ডাল-

চিমস্কির চোখে। নির্লিপ্ত চেহারা।

কিন্তু দু'দিন নয়, বন্দীকে কথা বলাতে একানব্বই ঘণ্টা কয়েক মিনিট লেগে গেল। তবে মুখ খোলার পর গড় গড় করে সবই বলে ফেললো সে, কিছুই লুকালো না। কর্নেল বিকারেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, স্ট্যালিন পন্থীদের বড়সড় একটা সুশৃংখল দল ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করেছিল। চারশোরও বেশি সরকারী এবং সশস্ত্র-বাহিনীর লোক জড়িত। তাদের মধ্যে আবার অর্ধেকের কিছু কম কে. জি. বি.-র লোক—কেউ কেউ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে রয়েছে। কিন্তু বন্দী লোকটা সবার নাম জানে না। মাত্র তেরো জনের।

তাদের একজন একটা মেয়ে, লেনিনগ্রাদে পোস্টিং, অ্যাডমিরাল ইন কমাণ্ডের সেক্রেটারী।

আরেকজন কর্নেল, ওডেসার কাছে এটকা কমাণ্ডো ইউনিটের ইনচার্জ।

আরেকজন মার্শাল ওনায়েভ।

চতুর্থজন কে. জি. বি.-র চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্ট, দানবাকৃতি নিকোলাই ডালচিমস্কি। তেরো জনের একজন বাদে সবাইকে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের মধ্যে শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কি নেই। কিভাবে যেন পালিয়ে গেছে সে, পিছনে কোনো সূত্র রেখে যায়নি। পুলিশ, আর সমগ্র সোভিয়েত সীমান্তে প্রহরারত ফ্রন্টিয়ার কন্ট্রোল ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়া হলো। ডালচিমস্কির সন্ধানে চষে ফেলা হলো গোটা দেশ।

কিন্তু সে নেই।

'দিমিত্রি ট্রুশেনকো' মচকাবার পর গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে টানা একমাস ব্যাপক ধর-পাকড় চললো। ষড়যন্ত্রকারীদের কিভাবে ধরা যায় তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন কর্নেল বিকারেন, প্ল্যান অনুসারে অপারেশন চালিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সফল হলেন তিনি। শুধু দেশের মাটিতেই গ্রেফতার করা হলো তিনশো বিয়াল্লিশজনকে। নয় জন ধরা দিলো না, আত্মহত্যা করে হাত ফস্কে গেল। বিদেশের মাটি থেকে আটক করে দেশে পাঠানো হলো আঠারো জনকে, বাষট্টি জন নিখোঁজ থাকলো। এতো বড় সাফল্য সত্ত্বেও কে. জি. বি. কর্মকর্তারা খুশি হতে পারলেন না। খুশি অবশ্য না হবারই কথা তাঁদের। মুখে না বললেও, মনে মনে তাঁরা সবাই জানেন, কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ধর-পাকড়ের বেশিরভাগ অপারেশনে অফিসারদের সাথে নিজে অংশগ্রহণ করলেন কর্নেল বিকারেন। রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়ালেন প্রায় পুরোটা মাস। ভ্লাডিভোস্টক-এর এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার থেকে গেলেন রিগা-র বালটিক টেলিকমিউনিকেশন সেন্টারে। রুশ-ইরান সীমান্ত থেকে একটা প্লেন চালিয়ে চলে এলেন রুশ-চীন সীমান্তে। দু'চার দিন পর পর মস্কোতেও ফিরে আসতে হলো তাঁকে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেনাবাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আটক করা হলো, ক্রোপুতকিন স্ট্রীটের বেসমেন্টে নিয়ে যাবার পর এদের বেশ কয়েক জনের কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে এলো। শতাধিক সিনিয়র সরকারী অফিসার, প্রিমিয়ার এবং জেনারেল সেক্রেটারী, সেই সাথে নয় জন পলিটব্যুরো সদস্যকে খুন করার প্ল্যান করেছিল তারা। তাদের মধ্যে দু'জন প্রথমবার মুখ খুলে আভাস

দিলো যে কে. জি. বি.-র আরো প্রায় দেড়শো অফিসার এবং এজেন্ট এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয়বার মুখ খোলার আগেই অকস্মাৎ মারা গেল তারা। সন্দেহ করা হলো, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

বিশেষ একটা তদন্ত টিম গঠন করা হলো। কিন্তু তাদের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হলো না। বলা হলো, মাত্রাতিরিক্ত আতংকের কারণে হার্টফেল করে মারা গেছে তারা। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কঠিন হৃদয় পাষাণ ছিলো তারা, ভয় বা আতংক কাকে বলে জানতো না।

কর্মকর্তাদের মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। তাঁরা জানলেন, কে. জি. বি.-র ভেতর, তাঁদের আশপাশেই, ষড়যন্ত্রকারীরা রয়েছে। কিন্তু সবাই নাগালের বাইরে।

প্রকাশ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলা হলো না। গোটা ব্যাপারটা একা সামলালেন কর্নেল বিকারেন। এবারও চমৎ-কার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন তিনি। রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন বৈঠক বসলো, অংশ নিলেন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ, কে. জি. বি. চীফ, রেড আর্মি স্টাফ চীফ, পলিটব্যুরোর প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য, সেনাবাহিনী, নেভি ও এয়ারফোর্স চীফ, এবং প্রিমিয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারীর সামরিক উপদেষ্টারা। অভি-যুক্তদের প্রত্যেককে কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো। সবাই নিজে-দের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

বলাই বাহুল্য, একজনকেও ক্ষমা করা হলো না।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো নিপুণ কৌশলে। এখানেই বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেন কর্নেল বিকারেন। অফি-

শিয়াল গেজেটে প্রকাশ না পেলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবে ভূষিত করা হলো তাঁকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি তাঁর ডেপুটিকে বললেন, 'ভাগ্যিস এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল! আমার পদটা পেতে তোমার সামনে আর কোনো বাধা থাকলো না।'

কিন্তু সদাহাস্যময় কর্নেলের চেহারা থেকে হাসি যেন চির বিদায় নিয়েছে। বিষণ্ণ চোখ তুলে তিনি শুধু বললেন, 'আমি যে কতোখানি ব্যর্থ, আপনার চেয়ে ভালো কেউ তা জানে না, জেনারেল কমরেড। আপনি তো অবসর নিয়ে বেঁচে যাবেন, কিন্তু আমি? কাকে বিশ্বাস করবো? কার ওপর ভরসা রাখবো? কি করে জানবো কে বেঈমান নয়?'

ডেপুটিকে আলিঙ্গন করে জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন, 'অবসর নেয়ার আগে যতোটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করবো আমি, আনাতোলি। হ্যাঁ, কে. জি. বি.-কে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।'

মার্শাল ওনায়েভ সহ ষড়যন্ত্রকারীদের আরো এগারোজন সিনিয়র সদস্য নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট বিস্ফোরণে কৃষ্ণ সাগরে মারা গেলেন। বাকিরা কেউ মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায় বা অগ্নিকাণ্ডে, কেউ হার্ট অ্যাটাকে। সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়, দেড়শোর মতো। দুর্ঘটনাগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘটলো, প্রচুর সময়ের ব্যবধানে, এবং সবগুলো খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও পেলো না।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়, ল্যাংলিতে একটা আলোড়ন উঠলো। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের অদূরে এই ল্যাংলি-

তেই সুদৃশ্য বনভূমি ঘেরা বিশাল ভবনটা সি. আই. এ. হেডকোয়া-র্টার। ভবনটাকে পাহারা দেয় অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়বহুল ইলেকট্রনিক আর সোনিক হার্ডওয়্যার, ডগ প্যাট্রল, এমন কি ট্রেনিং পাওয়া অ্যালিগেটর, উডচাক টিম, আর কিলার হামিংবার্ড। ল্যাংলিতে এমন অনেক কমপিউটর আছে, যেগুলোর নামও ক্লাসিফায়েড—টপ সিক্রেট, প্রকাশযোগ্য নয়। কোনো কোনো কমপিউটর বসাতে খরচ পড়েছে বত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার। আর আছে সি. আই. এ.-র বেতনভুক অ্যানালিস্ট—কারো কারো বেতন প্রেসি-ডেন্টের চেয়ে ছয় গুণ বেশি। তাদের মধ্যে একজন হলো স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা, উনিশশো ছেষট্টি সালে আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপিউটর সায়েন্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করে। তার নাম চ্যারিটি উডস্টক, পাঁচ ফিট লম্বা, একহারা, সারা মুখে খয়েরি তিল। তেমন লম্বা নয় বলে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে তাকে নিয়ে কৌতুক করে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি বা মাথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে এমন লোক একজনও পাওয়া যাবে না।

এই প্রতিভাময়ী অ্যানালিস্ট চ্যারিটি উডস্টক কমপিউটর প্রিন্ট-আউট পরীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলো, গতমাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী এবং সেনাবাহিনীর লোকজন অস্বাভাবিক হারে মারা গেছে। তার মনে হলো, মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো হলেও, তা হয়তো সত্যি নয়। সম্ভবত বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে ওখানে। গত ছত্রিশ মাসের মৃত্যু হার যোগাড় করে গতমাসের মৃত্যুর হারের সাথে মেলালো সে, তারপর পিন দিয়ে গেঁথে কাগজগুলো সেকশন চীফের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

কর্নেল জিল ক্যাসেল সন্তুষ্ট হলো, কিন্তু বিস্মিত হলো না। রূপ-

বর্তী চ্যারিটি উডস্টকের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর পঞ্চাশোর্ধ কর্নেলের নির্ভে-জাল শ্রদ্ধা আছে, শুধু যদি কর্নেল তার লোলুপ দৃষ্টি একটু সংযত করতে পারতো তাহলে হয়তো ভালোই বনিবনা হতো দু'জনের। সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়ে আছে ওই একটা মাত্র জিনিস—কুদৃষ্টি। সুযোগ পেলেই আড়চোখে চ্যারিটি উডস্টকের বুকের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেবে কর্নেল। মেয়েটা সবই লক্ষ্য করে, এবং ব্যাপারটা একাধারে অপরিণত ও মর্যাদা হানিকর লাগে তার কাছে।

'ভালো, খুব ভালো,' কাগজগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে বললো কর্নেল, আরেকবার চোখ বুলিয়ে আদর করলো মেয়েটাকে।

'আপনি তাহলে রিপোর্টটা সোভকম-এ পাঠাবেন, মিঃ ক্যা-সেল?' কর্নেলের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মনে মনে রেগে যায় চ্যারিটি উডস্টক, তারপর সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে যে বেচারা মধ্য-বয়স্ক লোকটা আসলে বড় বড় সোশিও-কালচারাল সমস্যার ছোট্ট একটা নমুনা মাত্র।

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, সিরিয়াসলি ভেবে দেখবো আমি,' বললো কর্নেল। সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো, বাঁ দিকেরটা একটু বোধহয় বড়।

কর্নেল ক্যাসল, স্বভাব দোষ তার যাই থাক, ঘিলুর কোনো ঘাটতি নেই মাথায়, প্রথম সুযোগেই সোভকম-এ—সি. আই. এ.-র সোভিয়েত অ্যাফেয়ার্স কমিটি—পেশ করলো কাগজগুলো। কমিটি প্রতি সোমবার বিকেলে মিটিঙে বসে। সোভকম সাথে সাথে সদ্য পাওয়া তথ্যের সাথে সর্বশেষ প্রাপ্ত স্মলেনস্ক মিসাইল কমপ্লেক্সের স্যাটেলাইট ফটো মিলিয়ে দেখলো, এবং উদ্বেগের সাথে উপসং-হারে পৌঁছুলো যে বিপর্যয় নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কমিটি পরামর্শ দিলো, সোভিয়েত রাশিয়ার কাছাকাছি যে-সব মার্কিন

ইন্টেলিজেন্স নেট ওঅর্ক রয়েছে তারা জোর তদন্ত চালিয়ে দেখবে বিপর্যয়ের প্রকৃতিটা কি।

ফলাফল শূন্য। কাগজের বুকে কিছু আইডিয়া আর থিওরি আত্মপ্রকাশ করলো মাত্র, নিরেট কিছুই জানা গেল না। তাই বলে সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে কেউ হতাশ হলো না, আর চ্যারিটি উডস্টক তো কোনো কিছুতেই হতাশ হবার পাত্রী নয়।

মস্কোয় কর্নেল বিকারেন আগেই হাসতে ভুলে গেছেন, এবার জেনারেল কায়কোভস্কির দুর্লভ হাসিও উধাও হলো – কারণ ব্রাসেলস-এ নতুন আরেকটা সিকিউরিটি সমস্যায় পড়ে গেছে কে. জি. বি.। ওখানে একটা ব্যাংক আছে, আর সব ব্যাংকের মতোই স্বাভাবিক টাকা-পয়সা লেনদেন করে। কিন্তু আসলে ওটা কে. জি. বি.-র একটা ফ্রন্ট। কে. জি. বি. এজেন্ট যারা পশ্চিম ইউরোপে কাজ করছে, এবং যারা ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের ওপর নজর রাখছে তাদেরকে ফাণ্ড যোগান দেয় এই ব্যাংক। কে বা কারা ব্যাংকের ভেতর কিভাবে যেন রাতের বেলা ঢুকে পড়ে, দু'জন গার্ডকে গুলি করে মারে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দেয়, তারপর ডাকাতি করে নিয়ে যায় তিন লাখ বিরানব্বই হাজার মার্কিন ডলার। আরো বড় অংকের ফ্রাঙ্ক, মার্ক, পাউণ্ড ছিলো, কিন্তু সে-সবে হাত দেয়া হয়নি।

কেন ?

এ কোন্ ধরনের চোর বা ডাকাত যে নগদ ছয় লাখ পাউণ্ড, চার লাখ মার্ক, আর বারো লাখ ফ্রাঙ্ক হাতে পেয়েও নিলো না ?

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে জোরে টান দিয়ে জিভ প্রায় পুড়িয়ে ফেললেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মাথা ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্তে

পৌঁছলেন : হয় কে. জি. বি. বেলজিয়াম সেকশনে বিদেশী চর অনুপ্রবেশ করেছে, নয় তো সোভিয়েত এজেন্টদেরই কেউ টাকার লোভে মানুষ খুন করে বসেছে। খুনী যদি বিদেশী এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই সে আমেরিকান। আর সে যদি রাশিয়ান হয়, নিশ্চয়ই আমেরিকায় পালাবে।

এই নতুন দুঃসংবাদ অবশ্য কর্নেল বিকারেনকে স্পর্শ করলো না। কারণ ছুটি নিয়ে কৃষ্ণ সাগর বেড়াতে গেছেন তিনি, পয়লা জুনের আগে ফিরবেন না।

ওই পয়লা জুনেই উন্মাদ হয়ে গেল এলিস থেলার।

পরদিন দৈনিক ডেলভার পোস্ট-এর রিপোর্টে বলা হলো, সময়টা ছিলো কাঁটায় কাঁটায় দুটো পঁচিশ মিনিট। তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুস্থ দেখা গেছে এলিস থেলারকে। থেলার অটো রিপেয়ার কোম্পানীর একজন মেকানিক জানালো, শুধু সুস্থ আর স্বাভাবিক নয়, ফোন কলটা আ[illegible]র আগে পর্যন্ত মালিককে রীতিমতো হাসি-খুশি আর উৎফুল্ল দেখেছে তারা। আগামী মাসে লস অ্যাঞ্জেলস রেসিং কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এলিস থেলার, এবং মেকানিকদের আবদারে সাড়া দিয়ে রাতে সবাইকে ডিনার খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ঠিক তারপরই, দুটো পঁচিশ মিনিটে, ফোন কলটা আসে। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর তাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল—কি রকম যেন একটা ঘোরে রয়েছে। কারো সাথে কথা বলেনি। কারো দিকে ভুলেও তাকায়নি। নীল একটা ডজ প্যানেল-ট্রাক ছিলো তালা দেয়া ছোট্ট গ্যারেজে, সেটা নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। এই ট্রাকটা অনেক দিন থেকে ছিলো

গ্যারেজে, কাউকে ছুঁতে দিতো না থেলার, চাবিটা সব সময় নিজের কাছে রাখতো।

শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস। সরাসরি সেখানে চলে যায় থেলার। গেটে তাকে বাধা দেয়া হয়, সেন্ট্রি তাকে পাস দেখাতে বলে। শান্তিপ্রিয়, সবার প্রিয়পাত্র এলিস থেলার পকেট থেকে পাস নয়, সেভেন-মিলিমিটার পিস্তল বের করে সরাসরি সেন্ট্রির মাথায় গুলি করে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরো দু'জন গার্ডের মাথা পাকা আততায়ীর মতো নিপুণ লক্ষ্যভেদে ফুটো করে দেয় সে। এরপর থেলার সোজা রাস্তা ধরে দেড় মাইল ট্রাক চালিয়ে চলে আসে বিল্ডিং এম পর্যন্ত। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামে সে। গাড়িটা সবেগে গিয়ে ধাক্কা খায় জানালাবিহীন ওয়্যারহাউসে।

তারপর যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তা থেকে আন্দাজ করা চলে, ট্রাকটায় হাই এক্সপ্লোসিভ ঠাসা ছিলো। আরো ছিলো ট্যাংক ভর্তি নাপাম, বিস্ফোরণের পরপরই লকলকে আগুনের শিখা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আগুন আর কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ কয়েক মাইল দূর থেকে দেখতে পায় মানুষ। কিন্তু এলিস থেলারকে কোথাও দেখা গেল না।

তাকে দেখা গেল টেলিভিশনে, সন্ধ্যার খবর পড়ার সময়। দর্শকরা তার লাশ দেখলো। অগ্নিদগ্ধ, বিধ্বস্ত ভবনটার মতোই চেহারা হয়েছে তার। বিস্ফোরণ ঘটবার পর তাকে পালাতে দেখে মিলিটারী পুলিশ একেবারে শেষ মুহূর্তে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে দেহটা।

ভাবতে গেলে অনেক দিক থেকেই ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। গণ-

তন্ত্রের দেশে অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়, তার সাংবিধানিক অধিকারের কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মিলিটারী পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলায় এলিস থেলার তার উকিলকে ফোন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

তাছাড়া, কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেলো না। ছোটোবেলায় হয়তো খুব অশান্তিময় জীবন কাটিয়েছে এলিস থেলার, ছেলেবেলার অতৃপ্তি বা ক্ষোভ এতো দিন হয়তো জমা ছিলো তার মনের ভেতর, আজ হঠাৎ করে বিস্ফোরণের সাথে বেরিয়ে এসেছিল সব। এই আকস্মিক উন্মত্ততার কোনো কারণ না থেকে পারে না, তাকে সামনে পেলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়তো কারণটা আবিষ্কার করতে পারতো।

এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে অনেক লোকই বিবৃতি দিলো, প্রেস রিলিজ প্রকাশ করলো কেমিক্যাল করপোরেশন। বেশিরভাগ প্রেস রিলিজ যেমন হয়ে থাকে, এটাও সেরকম হলো, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এম বিল্ডিঙে যে জার্ম ওয়রফেয়ারের কাজে ব্যবহার যোগ্য অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আর মেশিনারিজ ছিলো, প্রেস রিলিজে বেমালুম চেপে যাওয়া হলো সেটা। এম বিল্ডিং মাত্র তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের ডিপো ছিলো, সে প্রসঙ্গেও একটা টুঁ-শব্দ হলো না। কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রেস রিলিজ, লোকাল পুলিশের বিবৃতি, আর দমকল বাহিনী প্রধানের মন্তব্য, এই তিনটেকে ভিত্তি করে একটা রিপোর্ট তৈরি হলো, সেটাই ছাপা হলো গোটা দেশের পত্র-পত্রিকায়। নিউ ইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম পাতায় ছাপলো খবরটা। এই কাগজ দুটো থেকেই খবরটা কেটে মাইক্রোফিল্ম তৈরি করলেন রুশ দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে,

অন্যান্য আরো জিনিসের সাথে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। মস্কোয় পৌঁছে যাবে ওটা।

তিন

মাইক্রোফিল্মটা মস্কোয় পৌঁছুবার পরদিন আলবামার লেফটেন্যান্ট-গভর্ণরের বিরুদ্ধে অষ্টাদশী এক কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে, মেরিন বায়োলজির ছাত্রী, কোর্টে অভিযোগ তুললো, গভর্ণর রেপ করায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আমেরিকায় বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনায় শতাধিক লোক মারা যাওয়ায় শোকে কাতর হলো পত্রিকা পাঠকরা। হপ্তা শেষ হবার আগে প্যারিস সাবওয়ে, আর রোম বাস ড্রাইভার এসোসিয়েশন ধর্মঘটে গেল, ব্রিটিশ ডক শ্রমিকরা শুরু করলো অনির্দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি। খবর পাওয়া গেল হিটলারের ঘনিষ্ঠ একজন সহচর মেক্সিকোর এক রেস্তোরাঁয় সিগারেট-গার্ল হিসেবে আত্মগোপন করে আছে। মার্কিন নারকোটিক কন্ট্রোল এজেন্সি একটা জাহাজ থেকে উদ্ধার করলো দুশো তেইশ পাউণ্ড হেরোইন। সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কারণ রুশ ব্যালেরিনা ভোলিন স্বপক্ষ ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা

করেছে। এই সব নাটকীয় এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবরের তলায় চাপা পড়ে গেল ডেনভারের ঘটনাটা, সাংবাদিকরা নানা দিকে এতো বেশি ব্যস্ত থাকলো যে কেমিক্যাল করপোরেশনের বিস্ফোরণ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই তারা পেলো না। ব্যাপারটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করলো অন্তত সাতাশই জন লোক, কারণ এতে করে তাদের পক্ষে নির্বিঘ্নে তদন্ত চালানো সম্ভব হবে। এরা সবাই হয় বন গিলবার্ট, নয়তো স্টুয়ার্ট কুপারের লোকজন।

মেজর জেনারেল বন গিলবার্ট ইউ. এস. আর্মি কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স-এর কমাণ্ডার। আর মিঃ স্টুয়ার্ট কুপার এফ. বি. আই.-এর নতুন ডিরেক্টর। দুই ভদ্রলোকই যার যার পেশায় দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ, এলিস থেলার সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব জানার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় বলা হয়েছে, এলিস থেলার হয় উন্মাদ ছিলো, নয়তো গোপনে কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলো—কিন্তু ওঁরা দু'জন কেউ তা বিশ্বাস করলেন না।

বন গিলবার্ট বললেন, 'সারা জীবন স্বাভাবিক থাকলো একজন লোক, হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গিয়ে দেশের একটা নার্ভ-পয়েন্টে আঘাত করলো—এ হতে পারে না। আর, লোকটা অন্তর্ঘাতক ছিলো তার প্রমাণ কই?' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর সাথে একমত হলেন চীফ অভ স্টাফ।

স্টুয়ার্ট কুপার কম কথার মানুষ, তিনি শুধু বললেন, 'গোটা ব্যাপারটা রহস্যময় এবং সন্দেহজনক।' আর কে না জানে যে রহস্য থাকলে এফ. বি. আই. সেটা ভেদ করার দায়িত্ব নেবে। সন্দেহ নেই, এফ. বি. আই.-এর সে যোগ্যতা আছেও।

নিউজ মিডিয়াগুলো যখন আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর নিয়ে ব্যস্ত, এই দুই ফেডারেল এজেন্সি তখন এলিস থেলারের ব্যাপারে ব্যাপক ইনভেস্টিগেশন শুরু করলো। ফাণ্ড এবং লোকবল, কোনোটারই তাদের অভাব নেই।

রুটিন চেক নয়, ফুল ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো। রাত দুপুরে কয়েক শো লোকের দরজায় টোকা পড়লো। সাবজেক্টের প্রাক্তন স্কুল মাস্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, প্রতিবেশীদের সাথে বৈঠক হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মেথর আর মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের জেরা করা হলো। এদের বেশিরভাগই বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, এলিস থেলারের মতো মানুষ কি করে ফেডারেল এজেন্সির সাবজেক্ট হতে পারে! ছায়াছবি বা টিভি নাটক দেখে তাদের ধারণা হয়েছে—নীচ, ধনী, রুচিহীন, ম্যানিয়াক লোকেরাই সাবজেক্ট হয়। এলিস থেলার তো তাদের কারো মতো ছিলো না! নিয়মিত চার্চে যেতো সে, রেজিস্টারড রিপাবলিকান ছিলো, বড় যে-কোনো ধরনের চ্যারিটি ফাণ্ডে দান করতো। কেউ বললো না যে তার কোনো শত্রু ছিলো। শিশুদের ভালোবাসতো থেলার, প্রতি রোববারে বুড়ো-বুড়িদের ক্লাবে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার পাঠাতো। লালচুলো এক মেয়ে জানালো, এলিস থেলার ক্রিস্টমাস ডে বা তার জন্মদিনে উপহার পাঠাতে ভুল করতো না কখনো, আর ফি হপ্তায় একবার আসা চাই-ই। মেয়েটার চোখে ভালোবাসার যে আলো দেখা গেল, প্রতি হপ্তায় তার সাথে দেখা করার পিছনে সেটার ভূমিকা কম নয়।

এতো বছর ধরে কলোরাডোয় ছিলো থেলার, গাড়ি চালাবার সময় কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করেনি বা ট্রাফিক আইন লংঘন করে টিকিট পায়নি। লোকাল এবং ফেডারেল, দু'তরফের ট্যাক্সই সময়

হলে পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে গেছে। মদ খেতো, কিন্তু পরিমাণে খুবই সামান্য। প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তাকে মাতাল হতে দেখেনি কখনো। ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন বাইবেল পড়তো সে। শনিবার ওয়েস্টার্ন গান ক্লাবে যেতো, রাইফেল আর হ্যাণ্ড-গানে হাতের টিপ ঠিক রাখার জন্যে প্র্যাকটিস করতো।

চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী কোনো গ্রুপের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায় না। নেশাখোর, যৌন-অপরাধী, ফোক ড্যান্সিং সোসাইটি, জুয়াড়ি, ঠকবাজ, প্রতারক, সাইকো-অ্যানালিস্ট, কবি, ব্ল্যাক-ম্যাজিশিয়ান, কিংবা অসামাজিক কোনো লোকের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কোনো লাইব্রেরীর সদস্য ছিলো না সে, বিদেশী ছায়াছবি একেবারেই দেখতো না। একজন ইন-ভেস্টিগেটর তার নোটবুকে লিখলো, 'এ-ধরনের নিষ্কলুষ একজন মানুষ, রাজ্যের আইন সভায় কেন যে নির্বাচিত হয়নি সেটাই আশ্চর্য!' আসলে এলিস থেলার ভালো বক্তৃতা দিতে পারতো না, আর তাছাড়া চেহারাটা তার ঠিক সুদর্শন ছিলো না।

দু'মুখো তদন্ত চলতে থাকলো। আর্মি তার সার্ভিস রেকর্ড ঘাঁটতে শুরু করলো, আর এফ. বি. আই. তার আর্থিক অবস্থার গভীরে কিছু লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ নিতে লাগলো। এফ. বি. আই. জানতে পারলো, থেলারের ট্যাক্স পেমেন্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে। সময়টা হলো—তার ডেনভারে আসার আগের তিন বছর। তারপর জানা গেল, শুধু ট্যাক্স পেমেন্ট নয়, বাকি অন্যান্য সমস্ত রিপোর্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে, অথচ কেউ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। থেলার চিরকুমার ছিলো, তার মা-বাবা এবং ওর বড় একমাত্র বোনটা অনেক বছর

আগেই মারা গেছে। আমি ইন্টেলিজেন্স যা আবিষ্কার করলো তা তিন বছর রহস্যের চেয়ে আরো বিভ্রান্তিকর। সতেরো বছর আগে এলিস থেলার একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, এবং তার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী তার মাকে পঁচিশ হাজার ডলার ক্লেইম-ও পেমেন্ট করেছে, বুড়ি মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে।

'আমি জানতাম সান-অভ-আ-বীচ আসলেই একটা সান-অভ-আ বীচ,' আবিষ্কারের আনন্দে উল্লাসের সাথে বললেন বন গিলবার্ট। 'এখন আমাদের জানতে হবে সান-অভ-আ-বীচটা সত্যি সত্যি কে ছিলো।' এলিস থেলার উনিশ শো ত্রিশ সালে ডেটনে জন্মগ্রহণ করে, কোরিয়ান যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে করপোরাল হিসেবে ছিলো সে। আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেল যোদ্ধা থেলার আর সদ্য নিহত থেলার এক ব্যক্তি নয়, দ্বিতীয় থেলার কোরিয়ায় যুদ্ধই করেনি। এরপর এফ. বি. আই. আবিষ্কার করলো, তিন বছর গ্যাপের পর ট্যাক্স রিটার্নে যে সই দেয়া হয়, তিন বছর আগে দেয়া সইগুলোর সাথে তার কোনো মিল নেই। সদ্য নিহত লোকটা এলিস থেলার নয়, এটা নিশ্চিতভাবে জানার পর আমেরিকার বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে তার সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হলো। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, এ-ধরনের কেস মীমাংসার জন্যে এফ. বি. আই.-ই সবচেয়ে উপযুক্ত সংস্থা।

সেটা উনিশে জুনের ঘটনা।

বিশ তারিখে লিজা আইভরসন নামে চল্লিশোর্ধ এক মহিলা নিখোঁজ হলো। মহিলা লিজা'স বুদ-এর মালিক, অগাস্টার দুটো জনপ্রিয় বিউটি শপের একটা ওটা। কোটিপতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী ইলিনা লোপেজের চুল রঙ করছিল সে, এই সময় টেলিফোনটা

আসে। পাঁচ মিনিট পর লিজা আইভারসন নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্যাংকে যায়, সেফটি ডিপোজিট বক্স থেকে একটা প্যাকেট বের করে সে। আলবানি, নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে ডিপোজিট বক্সটা ভাড়া নেয়া ছিলো তার, বারো বছর ধরে। ব্যাংক রিপোর্ট অনুসারে, এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায় লিজা আই-ভারসন।

তারপর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সরু একটা গলিতে পাওয়া গেল গাড়িটা, আগুন লাগার জায়গা-টা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আগুন লাগার ফলে জেট ফাইটার বেসের প্রায় সবটুকু তেল পুড়ে যায়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে উত্তর-পুব আমেরিকার ওপর শত্রু বিমান হানা দেয়ার কোনো হুমকি সেদিন বা পরবর্তী তিন দিন ছিলো না। চার চারটে দিন আমেরিকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাময়িক একটা ফুটো তৈরি হয়েছিল—মহামূল্যবান ছাতায় সাময়িক ছোট্ট একটা ফুটো—তার-পর চব্বিশ তারিখ বিকেলে ফুয়েল ট্রাক পৌঁছে গেলে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটে। ইউ. এস. এয়ারফোর্স অফিস থেকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম পাঠানো হলো, টেকনিক্যাল এক্স-পার্টরা আগুনের কারণ, কে দায়ী, ইত্যাদি জানার জন্যে তদন্ত চালাবে। কিন্তু আগুন লাগার সাথে লিজা আইভারসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা ওরা কেউ এক করে দেখলো না।

অগাস্টা থেকে কমবেশি হাজার মাইল দূরে লাক দু ফ্লামবিউ। প্রায় নির্জন, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছড়াছড়ি, ফিল্ম-মেকারদের জন্যে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখানে কেউ ছবি করতে আসে না, কারণ

উত্তর-ঘেঁষা উইসকনসিন বনভূমির ভেতর লাক দু ফ্লামবিউ ছোট্ট একটা শহর। উইসকনসিন বনভূমিতে, শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে রয়েছে একটা ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এই ইণ্ডিয়ানদের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, এমনকি তারা মারমুখোও নয়; কাজেই অল্প দু'চারজন শিকারী বা ট্যুরিস্ট এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করলেও ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশনের দিকে পা বাড়ায় না। পুবে রয়েছে রেইনবো রিজার্ভেশন, আর দক্ষিণে উইলো রিজার্ভেশন। এ-দুটোও মানুষকে আকৃষ্ট করে না। আদি এবং অকৃত্রিম লাক দু ফ্লামবিউ প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, একমাত্র আধুনিক কাঠামো বলতে বোঝায় বিশাল এলাকা জুড়ে টোর‍্যান্স ন্যাভাল কমিউনিকেশনস স্টেশন। নামকরণটা করা হয়েছে একজন অ্যাডমিরালের নামে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এই বীর পুরুষ উনিশশো উনষাট সালে চীফ অভ ন্যাভাল অপারেশনস ছিলেন। সে বছরই টোর‍্যান্স তৈরি করা হয়।

তৈরি করা হয় না বলে, বলা উচিত খোঁড়া হয়। কারণ এই অসাধারণ সামরিক স্থাপনার মূল অংশই হলো মাটির নিচে লুকানো তার। সব মিলিয়ে একশো আঠারো মাইল। বিশাল এবং সুকৌশল নৈপুণ্যের সাথে ডিজাইন করা গ্রিড-টা দৈত্যাকৃতি অ্যান্টেনার আকৃতি নিয়ে রয়েছে, ওটার কাজ হলো চার থেকে বারো হাজার মাইল দূরে টহল রত মার্কিন পোলারিস সাবমেরিনগুলোকে চূড়ান্ত পর্যায়ের শর্টওয়েভ সিগন্যাল পাঠানো। টোর‍্যান্স গ্রিড থেকে পাঠানো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট বা জ্যাম করা সম্ভব নয়, গোপনীয়তা রক্ষার পেন্টাগন নীতির স্বার্থে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনো যদি কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পাল্টা আঘাত হানার

জন্যে থার্মোনিউক্লিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার নির্দেশ দিতে হয়, তাহলে এই টোর‍্যান্স গ্রিডের মাধ্যমে মোবাইল সাবমেরিনগুলোকে আণ্ডারসী রকেট নিক্ষেপ করার অর্ডার দেবেন তিনি। টোর‍্যান্স গ্রিড সম্পর্কে বিশদ খুব কম আমেরিকানই জানে, তবে রাশিয়ার সবটুকুই জানা আছে। টোর‍্যান্স গ্রিড সম্পর্কে একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে তাদের।

মার্কিন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট টোর‍্যান্স গ্রিডের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। গোটা স্থাপনাকে তিন প্রস্থ ইলেকট্রিফায়েড কাঁটা-তারের বেড়া বৃত্তাকারে ঘিরে আছে। পেরিমিটারে রয়েছে অসংখ্য সেন্ট্রি পোস্ট, একটা মাইন ফিল্ড, এবং ভ্রাম্যমান জীপ বহর। সারা দিন এবং সারা রাত ধরে হেলিকপ্টার গান-শিপ বেড়া ধরে উড়ে যায়, অনিয়মিত বিরতি দিয়ে।

টোর‍্যান্স কমিউনিকেশন স্টেশনকে নিয়ে লাক দু ফ্লামবিউয়ের কারো কোনো মাথাব্যথা বা আগ্রহ নেই, কারণ নেভির লোকজন শহরে বড় একটা আসে না। টেকনিশিয়ানদের জন্যে স্টেশন এলাকাতেই রয়েছে খেলার মাঠ, সিনেমা হল, সুপার মার্কেট, হাসপাতাল, সুইমিং পুল, ইত্যাদি। কেউ যখন আসে বা যায়, নিজেদের এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার করে তারা। আশপাশে অবশ্য আরো কয়েকটা এয়ারফিল্ড রয়েছে, কিন্তু সেগুলোয় স্টেশনের কোনো প্লেন কখনো ল্যাণ্ড করে না। শহরে লোক বসতি কম, শহরের বাইরে আরো দূরে দূরে বাস করে মানুষ। ইণ্ডিয়ানদের এতো টাকা নেই যে কোথাও যেতে হলে প্লেনে চড়বে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিকারী, অ্যাংলার, বা ট্যুরিস্ট যারা আসে তারাই ব্যবহার করে এয়ারফিল্ড-গুলো। আশপাশে অনেক লেক আছে, ভালো মাছ পাওয়া যায়,

এয়ারফিল্ডগুলোও লেকগুলোর কাছাকাছি। বেশিরভাগ লোকই হালকা প্লেন চার্টার করে আসে, উঠতে-নামতে অসুবিধে হয় না। পাইলটরা সবাই জানে টোর‍্যান্সের ওপরকার আকাশ নিষিদ্ধ এলাকা, কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা নয়, কারণ খালি আকাশের বিস্তৃতি প্রায় সীমাহীন। ইচ্ছে করলেই ঘাটি এলাকা এড়িয়ে প্লেন চালানো যায়।

নিষিদ্ধ আকাশ সীমা সম্পর্কে অবশ্যই জানা ছিলো বেন কুইকের। ডুলাথ-এ থাকে সে, সেখান থেকে ছোটো একটা প্লেন সার্ভিস চালিয়ে আসছে আজ অনেক বছর হলো। ডুলাথ এবং অন্যান্য শহর থেকে শিকারী বা অ্যাংলারদের নিয়ে লেক ঘেঁষে অমন কয়েক শো বার এদিকে এসেছে। এলাকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে সে, কারণ তার স্ত্রীর শরীরে অর্ধেক ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে। স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে বেড়াতে আসে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বছরে পাঁচ-সাতবার তো বটেই।

ছাব্বিশে জুন, সকাল। নিজের বাড়ির পিছনে, গ্যারেজে ছিলো বেন কুইক, লনমোয়ারে ফুয়েল ঢালছিল, এই সময় ফোন কলটা এলো। এর প্রায় নব্বই সেকেণ্ড পর তার স্ত্রী এসে বললো যে ডঃ টোবি টেমপল নামে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, উদ্দেশ্য বেন কুইককে বিকেল চারটের লেক টোমাহক ফ্লাইটের কথা মনে করিয়ে দেয়া।

'ভালো করে শুনেছো, ঠিক এই কথাগুলোই বললেন তিনি?'

'হুবহু, বেন। মেসেজের ব্যাপারে তুমি কেমন খুঁতখুঁতে জানি বলে প্রতিটি শব্দ মনে করে রেখেছি,' মিসেস বেন কুইক স্ত্রী-সুলভ

হাসলো।

'তাহলে বরং প্লেনটা একবার চেক করে আসি।' গম্ভীর দেখালো বেন কুইককে, কেমন যেন অন্যমনস্ক। তবে, রওনা হবার আগে স্ত্রীকে চুমো খেলো সে, বলা যায় একটু বেশি সময় নিয়েই এবং একটু বুঝি বেশি আবেগের সাথে—মাত্র আট ঘণ্টার জন্যে ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে, সে-কথা ভেবে স্বামীর আচরণ একটু যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো স্ত্রীর কাছে। প্রেম-ভালোবাসার এ-ধরনের খোলামেলা প্রকাশ অন্তত দিনের বেলা পাইলট সাহেবের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না, আকস্মিক এই ঢল ভালোই লাগলো তার। মনে মনে ভাবলো, মা হবার আশা এবার হয়তো তার পূরণ হতে পারে। অনেক বছর ধরেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে আসছে বেন কুইক।

স্টেশন ওয়াগন নিয়ে সী-প্লেন বেসে চলে এলো বেন কুইক, অ্যামফিবিয়ান-টা ভালোভাবে চেক করে নিয়ে বেলা একটার আগেই টেক-অফ করলো। বিকেল চারটে পর্যন্ত বা ডঃ টোবি টেম্পলের জন্যে অপেক্ষা করলো না সে। লেক টোমাহকের উদ্দেশ্যে একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করলো, রওনা হলো নরমাল রুট ধরে।

অন্যান্যবার যা করে, এবার তা করলো না বেন কুইক—টোর‍্যান্স-কে ঘিরে চক্কর দিলো না। তার বদলে সী-প্লেনটাকে হঠাৎ মাটির মাত্র এক শো ফিট ওপরে নামিয়ে আনলো, তারপর টপ স্পীডে ছুটলো নিষিদ্ধ এলাকার দিকে।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এলো প্লেন। নতুন লো-স্ক্যান রাডারে ধরা পড়লো সেটা। অ্যালার্ম বেল বেজে উঠলো। নয় নম্বর সেন্ট্রি পোস্টে একজন মেরিন প্রাইভেট খপ্ করে ধরে ফোনের রিসিভার

তুললো।

'হট পিস্টল! হট পিস্টল!' আর্তনাদ শুরু করলো সে। 'অচেনা এয়ারক্রাফট সরাসরি কমাণ্ড পোস্টের দিকে যাচ্ছে! বেয়ারিং ডেল্টা, খুব নিচে দিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে!'

'হট পিস্টল' সত্যিকার বিপদ সংকেত কোড, প্রতি দু'হপ্তা পর-পর যে মহড়া হয় তার সাথে এই কোডের কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগে কখনো টোর‍্যান্সে হট পিস্টল পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। কমাণ্ড পোস্টে কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট তাই তিন সেকেণ্ড ইতস্তত করলো। এই তিন সেকেণ্ডেই ঘেমে গোসল হয়ে গেল সে। কি করবে বুঝতে পারছে না। খুব সম্ভব চার্টারড প্লেনের কোনো হাবাগোবা পাইলট বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সিভিলিয়ান প্লেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই—কারণ ইউ. এস. বা ক্যানাডিয়ান রাডারকে ফাঁকি দিয়ে টোর‍্যান্সের হাজার মাইলের মধ্যে শত্রুপক্ষের কোনো বৈরী সামরিক বিমান ঢুকতে পারবে না। তিন সেকেণ্ড সময়ের শেষ দিকে লেফটেন্যান্টের চেহারা ভূতের মতো কালো হয়ে উঠলো, দাঁতে দাঁত চেপে কাঁধ ঝাঁকালো সে, তারপর যা করার ট্রেনিং পেয়েছে তাই করলো।

ডেস্কের দিকে মুখ করা কনসোলে অনেক বোতাম, তার একটা টিপে দিলো সে। গোটা টোর‍্যান্সে চরম সতর্ক সংকেত বেজে উঠলো। এ এমন একটা পিলে চমকানো আওয়াজ, অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় নেই। কমাণ্ড পোস্ট থেকে প্রায় নব্বই গজ দূরে ছিলো সার্জেণ্ট ডেভিড কপার, চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। হাতল ঘুরিয়ে সে তার রেড-আই মিসাইল লঞ্চার ওপর দিকে তুললো, আরেক ঝাঁকিতে বসিয়ে নিলো নিজের কাঁধে, তার-

পর পেরিমিটারের দিকে মারমুখো দৃষ্টিতে তাকালো।

'কী সর্ব্বোনাশ!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করলো সে। গাছ-পালার মাথার আড়াল থেকে প্লেনটাকে বেরিয়ে আসতে দেখছে।

ঠিক ওই সময় একটা মাইক্রোফোনে হড়বড় করে কথা বলছে লেফটেন্যান্ট। উদ্দেশ্য প্লেনটার ফ্রিকোয়েন্সি জানতে পারলে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেবে। হয় সে ফ্রিকোয়েন্সি পেলো না, নয়তো পাইলট শুনছে না। প্লেনটা তুমুল বেগে এগোতেই থাকলো। সোজা হলুদ বিল্ডিংটার দিকে যাচ্ছে ওটা। ওই বিল্ডিংটাই কমাণ্ড পোস্ট, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ইকুইপমেণ্ট রাখা আছে ওখানে।

'কী সর্ব্বেনাশ!' সার্জেণ্ট কপার আবার স্বগতোক্তি করলো, তারপর ঈশ্বরের নাম জপে টিপে দিলো রেডআই রকেটের ট্রিগার।

চোখের পলকে সী-প্লেনটা আগুনের একটা বল হয়ে গেল। সার-ফেস-টু-এয়ার মিসাইল আঘাত করেছে ওটাকে। আগুনের বলটা মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটলো, উত্তপ্ত ধাতব পিণ্ড ছড়িয়ে পড়লো আধ মাইল এলাকা জুড়ে। তারপরই আরেকটা বিস্ফোরণ, তৈরি হলো নব্বই গজ ডায়ামিটার জুড়ে পুরোপুরি ছ'ফিট গভীর একটা গর্ত।

ঘটনা সম্পর্কে যথা সময়ে সরকারী একটা ভাষ্য পাওয়া গেল। সেটা ছাপাও হলো পত্রিকায়। আকাশে থাকা অবস্থায় একটা টুইন-এঞ্জিন গ্রুপম্যান অ্যামফিবিয়ানে আগুন ধরে যায়। চার্টারড ফ্লাইটে লেক টোমাহকে যাচ্ছিলো ওটা। সিভিলিয়ান পাইলট টোর‍্যান্স স্ট্রিপে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের জন্যে চেষ্টা করে।

প্লেনে এক্সপ্লোসিভ কার্গো ছিলো, কিন্তু প্রেসনোটে তার কোনো

উল্লেখ থাকলো না।

অফিশিয়ালি ঘটনাটা তদন্ত করার দায়িত্ব পেলো ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স। নেভির পাবলিক রিলেশন্স বিশেষজ্ঞরা একাধারে অস্বস্তি এবং অপ্রতিভ বোধ করলো। ঘটনাটা যদি সামরিক কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ না হয়ে থাকে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনাবিহীন এই শান্তিময় সময়ে একটা অসামরিক প্লেনকে পাইলট সহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পিছনে কোনো যুক্তি ধোপে টিকবে না। পাইলট যদি স্রেফ ভুল করে থাকে, জনসাধারণ ব্যাপারটা জানতে পারলে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু মেরিন কমাণ্ড্যাণ্ট জেনারেল গ্যাবি হিনম্যানের প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

'সার্জেণ্ট কপারকে এই মুহূর্তে লাইনে চাই!' হুকুম করলেন তিনি।

লাইনে আসতে চার মিনিট লেগে গেল সার্জেণ্টের।

'সার্জেণ্ট কপার, দিস ইজ দি কমাণ্ড্যাণ্ট।'

'ইয়েস, স্যার!'

'কপার, নেভির পাবলিক রিলেশন্স তোমার সাড়ে সর্বনাশ করার পাঁয়তারা কষছে। আজ বিকেলে তুমি যা করেছো—বীরত্ব নয় কাপুরুষতা বলে মনে করছে ওরা। এখন ঠিক কি ঘটেছে সব আমাকে খুলে বলো—খবরদার—কিছুই লুকাবে না! ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যার! আমি আমার পজিশনে ছিলাম, স্যার। গর্তের ভেতর, চারধারে বালি ভর্তি বস্তা—সিকিউরিটি পজিশন, স্যার। সিকিউরিটি ডিউটিতে ছিলাম, জেনারেল। ইনটেরিয়র সিকিউরিটি, স্যার। পোস্ট নাইনটিন, সি. পি. থেকে আধ মাইলের মতো দূরে, স্যার। তেমন কিছু ঘটেনি, যদি জানেন ঠিক কি বলতে চাইছি···।'

'বাংকারে বসে পাছা চুলকাচ্ছিলে। তারপর কি হলো?'

'কী সব্বোনাশ! বিপদ-সংকেত গ্যাঁ গ্যাঁ করে উঠলো! টেস্ট

সিগন্যাল নয়, স্যার। হট পিস্টল সিগন্যাল ।'

'হ্যাঁ, জানি। বলে যাও।'

'রেডআই কাঁধে তুললাম। কী সব্বোনাশ, দেখি কি গাছের ওপর দিয়ে তেড়ে আসছে ওটা। ঠাট্টা বলে মনে হলো না, স্যার। স্কোপে চোখ রেখে দেখে নিলাম একবার, সেই সাথে চুকিয়ে দিলাম ঝামেলা। সে-অর্ডারই আমাকে দেয়া হয়েছে, স্যার। ওভাবে বিপদ সংকেত বাজলে আমার কাজ হবে এয়ারপ্লেন ধ্বংস করা, আর ঠিক তাই আমি করেছি।'

'বিউটিফুল,' মন্তব্য করলেন জেনারেল। 'বিউটিফুল শুটিং। মাত্র এক রাউণ্ড, তাতেই আকাশ থেকে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অভি-নন্দন, সার্জেন্ট। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত, এবং ওরা যতোই পাঁয়তারা কষুক তা নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আমি চাই না তুমি কোনো রিপোর্টারের সাথে কথা বলো, কপার। পরবর্তী প্লেনে চড়ে অ্যান্ড্রু বিমান ঘাটিতে চলে যাও। ওদিকে আজ যদি কোনো প্লেন না যায়, ওদের বলো তোমার জন্যে স্পেশাল একটার ব্যবস্থা করতে। দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

তিন ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনের কাছে অ্যান্ড্রু এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছে গেল সার্জেন্ট ডেভিড কপার, ঠিক ওই সময় মস্কোয় লেফটে-ন্যাণ্ট নিকিতা কুরাডিন ডকুমেণ্ট 'অডিট'-এর ফলাফল নিয়ে কর্নেল বিকারেনের অফিস ঘরে ঢুকলো। কাজটা শুরু করা হয়েছিল নিকো-লাই ডালচিমস্কি নিখোঁজ হওয়ার পর। সর্বশেষ আইটেমগুলোর সর্বশেষ তালিকা চেক করা হয়েছে। কে জানে সব ঠিকঠাক পাওয়া গেছে কিনা।

না, সব ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি। ভল্টে বেশ ক'টা ডকুমেন্ট নেই।

নিঃশব্দে রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল বিকারেন। আবার পড়লেন তিনি, তারপর আবার একবার। চোখ বুজে ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি। শিউরে উঠলেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁর বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেল। জেনারেল কায়কোভস্কির প্রাইভেট লাইনের দিকে হাত বাড়ালেন, আঙুলগুলো কাঁপছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে ভুলে গেলেন তিনি, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিলিঙের দিকে। একটা টিকটিকি ডেকে উঠতে সম্বিত ফিরে পেলেন।

'জেনারেল কমরেড কায়কোভস্কি মিটিঙে রয়েছেন,' জেনারেলের এইড, এক মহিলা ক্যাপটেন ব্যাখ্যা করলো।

'তা থাকুন, বলো জরুরী ব্যাপার, এখুনি তাঁর সাথে আমার কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু কর্নেল কমরেড, সিনিয়র অফিসারদের সাথে মিটিং করছেন তিনি···।'

'আমি তোমাকে হুকুম করছি জেনারেলকে খবরটা দাও—এই মুহূর্তে!' টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল বিকারেন। 'জেনারেল গুরুত্ব না দিলে বলো তাঁর ছেলেরা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

নব্বই সেকেণ্ড পর লাইনে এলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'আবার কি হলো, আনাতোলি? ক্যাপটেন ইলিনা বললো, তুমি নাকি অস্থির হয়ে আছো। আরেকটা ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছো নাকি?'

'তারচেয়েও খারাপ।'

‘তারচেয়ে খারাপ ? তারচেয়ে খারাপ কি হতে পারে ?’

কটমট করে লেফটেন্যান্ট কুরাডিনের দিকে তাকালেন কর্নেল, মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন নিঃশব্দে। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

‘আনাতোলি, কি ব্যাপার ?’ অপরপ্রান্তে ধৈর্য হারাচ্ছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘এক সেকেণ্ড…ঠিক আছে, এখন আমি একা। শুনুন। জেনারেল, আপনার মনে আছে চোদ্দ বছর আগে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম—আমি আর আপনি ?’

‘চোদ্দ বছর আগে ? কোন্ প্রজেক্টের কথা বলছো ?’

‘টেলি-বম।’

অপরপ্রান্তে ঝাড়া দশ সেকেণ্ড কোনো শব্দ নেই।

‘মনে আছে, জেনারেল ?’

এবার কথা বললেন জেনারেল, ‘কেউ ভোলে ?’

‘ডকুমেণ্ট অডিট শেষ করেছি আমরা, জেনারেল কমরেড। টেলি-বম বুকটা পাওয়া যায়নি।’

চার

ক্লিক।

স্ক্রীনে দাগহীন, রোদে পোড়া, একটু ফোলা ফোলা একটা মুখের ছবি ফুটে উঠলো। পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স। মার্কিনী ধাঁচে কাটা চুল, নেকটাইটা আমেরিকান।

এ-সবই এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর মনের মুকুরে গেঁথে নিলো অতিথি গুপ্তচর। একটা ফাইটার বম্বারের কাঠামো বা পোলারিস সাবমেরিনের কায়া দেখামাত্র চিনে নিতেও এরচেয়ে বেশি সময় লাগে না তার। মানুষ হিসেবে তার অনেক দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু মাথাটা কাজ করে বিদ্যুৎ বেগে। ভাগ্যের অকৃপণ সহায়তা পেয়েছে সে, প্রকৃতি তাকে বার-বার অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছে বিপদ থেকে, আর সেই সাথে বেড়েছে তার অভিজ্ঞতা। কৃতিত্ব আর সাফল্যের তালিকা দেখে মনে হতে পারে সে বোধহয় অতিমানব—সুপারম্যান—কিন্তু আসলে তা নয়। লোকে তার সাফল্যের খবর জানে, কিন্তু ব্যর্থতার খবর তাদের জানানো হয় না। অথচ সাফল্যের চেয়ে তার ব্যর্থতার সংখ্যা কম

নয়। তবে এ-কথা ঠিক যে এসপিওনাজ জগতের আর সবার থেকে সে আলাদা। কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে চর্চা করে নৈপুণ্য আর দক্ষতা অর্জন করেছে সে। কঠোর অনুশীলনে বিশ্বাসী, অমানুষিক পরিশ্রম করতে জানে। আর আছে ঝুঁকি নেয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা। ভাগ্য, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন, পরিশ্রম, এবং মেধা—সব মিলিয়ে তাকে করে তুলেছে প্রায় অজেয়, কিংবদন্তীর নায়ক।

'বলুন!' অন্ধকার ঘরে কর্নেল বিকারেনের গলা পাওয়া গেল।

'কি বলবো,' জবাব দিলো মাসুদ রানা। 'ওকে আমি চিনি না।'

ক্লিক।

স্ক্রীনে এবার এক মহিলার মুখ।

'একেও চিনি না,' বললো রানা। 'কারা এরা? বোঝা যাচ্ছে আমেরিকান, কিন্তু···।'

ক্লিক, ক্লিক।

প্রজেক্টর অফ হয়ে গেল, আলো জ্বলে উঠলো ঘরে। জেনারেল কায়কোভস্কিকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলো রানা।

'চোদ্দ বছর আগে অপারেশনটা শুরু হয়,' রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন জেনারেল। 'আমেরিকান ইউ-টু স্পাই ফ্লাইটের কথা মনে আছে আপনার? তার পরের ঘটনা।' পক্ককেশ বৃদ্ধের চেহারা দেখে মনে হতে পারে এইমাত্র কুইনাইন খেয়েছেন। 'তখন আমাদের মনে হয়েছিল, আমেরিকানরা বোধহয় আঘাত হানার জন্যে টার্গেট খুঁজছে। মনে হচ্ছিলো, একটা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে যাওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই এই প্রজেক্টটায় হাত দেই আমরা—টেলি-বম।'

মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু বারবার ছুটে যাচ্ছে

মনোযোগ। অনেক দুর্বলতার একটা হলো, ধূমপানের ব্যাপারে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। জানে ক্ষতিকর, মাঝে মধ্যে অনেক কষ্ট করে ছেড়েও দেয়, কিন্তু তারপর আবার ধরে। এই মুহূর্তে গলা বুক সব যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে বলে মনে হলো, সিগারেট ধরাতে পারলে বড় শান্তি পেতো। কিন্তু জেনারেল কায়কোভস্কি বস রাহাত খানের বন্ধু মানুষ, তাঁর সামনে ধরায় কি করে! নাকি ধরিয়ে বসবে? —ভাবছে রানা।

'টেলি-বম। আগে কখনো শুনিনি, জেনারেল,' বললো রানা।

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে জেনারেল বললেন, 'সিগারেট, মিঃ রানা?'

'জী-না, ইচ্ছে করছে না—ধন্যবাদ,' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো, তারপরই গাল দিয়ে ভূত ছাড়ালো নিজের। এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে!

'আপনার শোনার কথাও নয়,' রানার কথার খেই ধরে আবার শুরু করলেন জেনারেল। 'এ-ব্যাপারে গোপনীয়তার মাত্রা টপ সিক্রেটকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটার ভিত্তি ছিলো এক দল ডীপ-কভার এজেন্ট। এ-ধরনের ত্রুটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট আর কোনো দেশ তৈরি করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবে বলে মনে হয় না।' হঠাৎ মুখ তুলে ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'আনাতোলি, নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট কাকে বলে?' কৌতুকের সাথে নয়, অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উত্তরের জন্যে জেনারেল অপেক্ষা না করায় মোটেও অবাক হলো না রানা। জেনারেলরা সাধারণত অতোটা ধৈর্যের পরিচয় দেন

না।

'নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট,' বলে চললেন জেনারেল, 'হলো, যে জানে না সে ডীপ-কভার এজেন্ট। যতো যাই বলো, আনা-তোলি, আইডিয়াটা কিন্তু ইউনিক ছিলো! ব্রিলিয়ান্ট!'

'সে-সময় এর পিছনে যুক্তি ছিলো,' বিনয়ের সাথে বললেন কর্নেল বিকারেন।

'হিপনোসিস,' চুরুটের ডগাটা ছাইদানির মাঝখানে ঘষে ঘষে আগুন নেভালেন জেনারেল। 'চারশো ত্রিশজন মেধাবী লোককে এক জায়গায় জড়ো করি আমরা। কেউ কখনো দেশের বাইরে কোথাও যায়নি। সবাই ভালো ইংরেজী জানতো। আমেরিকান লাইফ-স্টাইল সম্পর্কে ওদের আমরা ট্রেনিং দেই, ড্রাগ-অ্যাসিস্টেড হিপনোসিসের মাধ্যমে। এক একজনের পিছনে টাকার পাহাড় খরচ হয়ে গেল, সময়ও লাগলো প্রচুর, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। ট্রেনিং শেষ হবার পর দেখা গেল, ওরা প্রত্যেকে নিজেকে সত্যি সত্যি আমেরিকান বলে বিশ্বাস করছে, সাথের কাগজ-পত্রে যা লেখা আছে সে-সবকে একমাত্র সত্য বলে জানছে। ওদেরকে আমরা পাঠিয়ে দিলাম। সবাইকে নয়, শুধু বাছাই করা কিছু ছেলে আর মেয়েকে। পিছনে কোনো সূত্র না রেখে প্রত্যেকেই ওরা নির্বিঘ্নে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করলো।'

'ফ্যানটাসটিক!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো রানা। সিগা-রেটের কথা ভুলে গেছে ও। চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, চেহারায় গভীর মনো-যোগের ছাপ।

'সবাই ওরা স্বাস্থ্যবান, সাবোটাজে কমপ্লিট ট্রেনিং পাওয়া লোক। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারী বা ন্যাভাল

টার্গেট স্থির করা ছিলো, সবাই যে যার টার্গেট এরিয়ায় সাফল্যের সাথে ঢুকে পড়ে। কারো মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না করে ওই এলাকায় শান্তিতে বসবাস করতে থাকে ওরা। সচেতনভাবে ওরা জানে না জায়গাগুলো বা শহরগুলো কেন তাদের এতো ভালো লাগে বা আকর্ষণ করে। যে যেখানে গেল সেখানেই রয়ে গেল, তার মনে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে জাগলো না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যে যার জায়গায় অপেক্ষা করছে ওরা।'

'কিসের জন্যে ?'

'কোড সংকেত,' ব্যাখ্যা করলেন কর্ণেল বিকারেন। 'প্রত্যেক এজেন্টের মনের গভীরে খোদাই করা আছে একটা কোড সংকেত। সেটা শুধু আমরা ব্যবহার করবো, কখনো যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধে। টেলি-বম আক্রমণ শুরু করার অধিকার বা ক্ষমতা শুধু একজনেরই আছে—প্রিমিয়ারের। এজেন্টদের কারো কারো মিশন এতোই বিপজ্জনক যে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'মৃত্যুকে হাসিমুখে মেনে নেয়ার জন্যে সবাই তৈরি হয়ে আছে ওরা,' বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। সময় নিয়ে নতুন একটা চুরুট ধরালেন তিনি। 'মৃত্যুর এই ইচ্ছেটাও তাদের মনে সুপ্ত অবস্থায় আছে।' যার যার এলাকায় বসবাস শুরু করলো ওরা, ঠিক এক বছর পর সবাই ওরা একটা করে ভিউকার্ড পাঠালো—কানাডায় আর মেক্সিকোয়, আগে ঠিক করা ঠিকানায়। 'পরে ওদেরকে একটা করে প্যাকেট পাঠাই আমরা। অবচেতন মনের নির্দেশে যে যার প্যাকেট লুকিয়ে রাখে।'

'এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ধোঁয়া

আড়াল সৃষ্টি করায় মাথাটা একটু কাত করে রানার দিকে তাকালেন। 'ছ'মাস পরপর লোকাল টেলিফোন গাইড চেক করে দেখে নিই আমরা, এজেন্টদের নম্বর ঠিক আছে, না বদলেছে। সরাসরি যোগাযোগ রাখা হয়নি, কারণটা পরিষ্কার। কোনো রকম ঝুঁকিই আমরা নেইনি, কাজেই ওদের পরিচয় কোনো দিনই ফাঁস হবে না।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড চিন্তা-ভাবনা করলো রানা, তারপর মাথা ঝাঁকালো। সত্যি, কোথাও কোনো ফাঁক দেখা যাচ্ছে না। 'প্ল্যানটা চমৎকার, কমপ্লিটলি ওয়াটার-টাইট। ত্রুটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট ওরা, সন্দেহ নেই। বেশ, তারপর? ওদের আপনারা বের করে আনতে চান?'

জেনারেল আর কর্নেল দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন কর্নেল বিকারেন, 'ভয়ংকর ঝুঁকি না নিয়ে ওদেরকে বের করে আনা সম্ভব নয়। ঝুঁকি নিলেও বের করে আনা সম্ভব কিনা তাও আমরা জানি না। কিন্তু সমস্যা ঠিক এটা নয়, আরো বড় সমস্যায় পড়েছি আমরা।'

'স্ক্রীনে যাদের ছবি দেখলাম, ওরা কারা?'

'মেয়েটাকে অগাস্টার সবাই লিজা আইভারসন হিসেবে চেনে,' প্রাক্তন পদাতিক সৈনিক বললেন: 'আর লোকটাকে ডেনভারের মানুষ জানে এলিস থেলার হিসেবে। এজেন্টদের মধ্যে সেরা দু'জন। দু'জনেই মারা গেছে—গেল মাসে।' একটু বিরতি নিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে বললেন আবার, 'ওদের জন্যে আমি গর্বিত। বীরের মতো মরেছে ওরা…'

'ওদের মৃত্যু অর্থহীন আর দুঃখজনক, আনাতোলি,' কর্কশ কণ্ঠে

বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'খাতাটা উদ্ধার করা না গেলে বাকিরাও এই অর্থহীন মৃত্যুর শিকার হবে। এবার সব বলো ওকে,' নির্দেশ দিলেন তিনি।

কর্নেলের দিকে তাকালো রানা।

'তেমন জটিল কোনো ব্যাপার নয়,' বেসুরো গলায় বললেন কর্নেল। 'সব ক'জন ডীপ-কভার এজেন্টের নাম আর ফোন নম্বর একটা ছোটো খাতায় লেখা আছে, আমরা সেটাকে টেলি-বম বুক বলি।'

'কোড সংকেত সহ।'

'হ্যাঁ। একই খাতা মোট তিনটে। একটা আছে কে. জি. বি. রেসিডেন্ট-এর কাছে, উনি আমেরিকায় কে. জি. বি.-র সমস্ত অপারেশন কন্ট্রোল করেন। খাতাটা আছে একটা অ্যাটাচি কেসে, তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করার ইকুইপমেন্ট সহ। দ্বিতীয়টা আছে রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের প্রাইভেট সেফে, রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স পাহারা দেয় সেফটাকে।'

'শেষটা?'

ইতস্তত করতে লাগলেন কর্নেল বিকারেন। রানার ব্যাপারে এখনো তাঁর মনে দ্বিধা রয়ে গেছে। টেলি-বম এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার, এর সাথে রাশিয়ার জীবন-মরণ প্রশ্ন জড়িত, রানার মতো বিদেশী একজন স্পাইকে সব কথা জানানো কি উচিত হচ্ছে? সব জানার পর রানা যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়?

কর্নেলকে ইতস্তত করতে দেখে মনে মনে রাগলেও জেনারেলের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি নিজেই শুরু করলেন তিনি, 'শেষ খাতাটা এখানে ছিলো। একটা বার্গলার-প্রুফ

ভল্টে, ওটায় কে. জি. বি.-র গুরুত্বপূর্ণ টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট রাখা হয়। সম্ভাব্য সব রকম আধুনিক অ্যালার্ম আর সিকিউরিটি ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও ভল্ট থেকে কিছু ডকুমেন্ট চুরি গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেলি-বম বুক।'

'কিভাবে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো রানা।

জেনারেল কায়কোভস্কি হয় এতো বেশি ভয় পেয়েছেন নয়তো এতো বেশি রেগে গেছেন যে কথাই বলতে পারলেন না। জ্বলন্ত চুরুটের লালচে ডগার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন তিনি।

সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে রানার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল বিকারেন, 'খাতাটা কে চুরি করেছে আমরা তা আন্দাজ করতে পারি।'

'কে?'

'তার নাম নিকোলাই ডালচিমস্কি—এখানকার একজন ডকুমেন্টস এক্সপার্ট। আমাদের বিশ্বাস পালাবার সময় ওটা নিয়ে গেছে সে। এপ্রিল মাসের ঘটনা।'

'হঠাৎ পালালো কেন?'

'সম্ভবত বুঝতে পারে তার গ্রুপটা ধরা পড়তে যাচ্ছে...।'

'সি. আই. এ.?'

'না, স্ট্যালিনিস্ট। জেনারেল সেক্রেটারী সহ আরো অনেক লোককে খুন করার প্ল্যান করেছিল ওরা।'

'গুড গড!'

'কয়েকটা পাসপোর্ট আর বিদেশে আমাদের একটা ব্যাংকের সিকিউরিটি ও অ্যালার্ম সিস্টেমের ড্রইং-ও নিয়ে গেছে ডালচিমস্কি।

নিয়ে গেছে মানে সে অদৃশ্য হবার পর থেকে ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাংকটা থেকে বেশ কিছু মার্কিন ডলারও ডাকাতি হয়েছে। দু'জন গার্ডকে খুন করা হয় ওখানে।'

'তারমানে নৈতিক কোনো বাধা নেই তার মনে,' বললো রানা। 'কি চায় সে ?'

'জানায়নি। যোগাযোগ করেনি।'

'আপনাদের ধারণা জানতে চাইছি।'

'লোকটা পাগলা কুকুর হয়ে গেছে, মিঃ রানা,' শুরু করলেন কর্নেল।

তাকে বাধা দিয়ে জেনারেল বললেন, 'চিরকাল তাই ছিলো, কিন্তু আমরা দেখেও দেখিনি।'

'সেটা মেয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তা-ও গুজবের মতো শোনাতো—কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি।'

'কি রকম ?' জানতে চাইলো রানা।

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,' বললেন কর্নেল। 'ডালচিমস্কি মেয়েদের ওপর নাকি অত্যাচার করতো। তার সহকারিণীরা কেউই তার সাথে বেশিদিন কাজ করতে পারতো না। স্যাডিস্ট ক্যারেক্টার বলতে পারেন।'

জেনারেল বললেন, 'সেক্স ম্যানিয়াক।'

'সে তাহলে পাসপোর্ট আর টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে···।'

'সাথে করে নিয়ে গেছে টেলি-বম খাতাটা,' বললেন কর্নেল বিকারেন।

'আমাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে আমেরিকায় রয়েছে সে, মিঃ রানা। দুটো ব্যাপারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই, কারণ আমরা

জানি। ব্যাংক ডাকাতির পর টেলি-বমদের নামগুলো চেক করি আমরা, কমপিউটরের সাহায্যে। জানতে পারি, পয়লা জুনে একটা মার্কিন আর্মি কেমিক্যাল ওঅরফেয়ার ঘাটিতে গুলি খেয়ে মারা যায় এলিস থেলার—মিশন কমপ্লিট করার পর। ওখানে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট থাকার কথা, কিন্তু ছিলো না। তারপর খবর পেলাম অগাস্টার জেট ফাইটার বেসে বড়সড় একটা আগুন লেগেছে —যেদিন লিজা আইভারসন নিখোঁজ হয়।'

'তারমানে আপনাদের হিউম্যান টাইম বোমাগুলোকে এক এক করে…।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, ফাটিয়ে দিচ্ছে।'

জেনারেলের দিকে তাকালো রানা। ভদ্রলোক চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছেন ওর দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রশ্নটা করলো রানা, 'আপনারা ঠিক কি চান আমার কাছ থেকে?'

কঠিন একটা প্রশ্ন, সাথে সাথে জবাব দিতে পারলেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। প্রথম থেকেই তিনি জানতেন, বি. সি. আই.-এর সাহায্য পেতে হলে তিনটে বাধা টপকাতে হবে তাঁকে। প্রথম বাধা ছিলো, বন্ধু মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে রাজি করানো। প্রায় একমাস ধরে তাঁর সাথে গোপনে এ-ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তিনি। তারপর যখন সাহায্যের আবেদনটা প্রকাশ্যে জানালেন, আচমকা বেঁকে বসলেন রাহাত খান। বি. সি. আই. চীফ অজুহাত দেখালেন, অন্য কোনো এজেন্টকে চাইলে ভেবে দেখতে পারি—যদিও কথা দিচ্ছি না—কিন্তু মাসুদ রানাকে হাতছাড়া করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে নিয়ে আমার অন্য রকম প্ল্যান আছে। সবশেষে তিনি তাঁর রুশ বন্ধুকে

বললেন, 'তুমি তো জানোই আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু হয়ে যাবার আগে কিছু কিছু দায়িত্ব ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি···।'

কথা শুনে জেনারেল কায়কোভস্কি বন্ধুর ওপর সাংঘাতিক চটে গেলেন। 'এ তোমার একটা খোঁড়া অজুহাত, রাহাত। তুমি আমার সমস্যাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছো না। বাইরের সাহায্য কেন দরকার হচ্ছে আমাদের, সেটা তুমি বুঝেছো কি?'

'হ্যাঁ, স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীরা যারা ধরা পড়েনি তাদের মধ্যে অনেক কে. জি. বি. এজেন্ট আছে বলে সন্দেহ করছো তোমরা,' বললেন রাহাত খান। 'তাদের পরিচয় তোমার জানা নেই, তাই বিশ্বাস করে এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টটা তাদের কারও ওপর দিতে পারছো না—এই তো? কিন্তু আরো তো মিত্র দেশ আছে তোমাদের, তাদের ইন্টেলিজেন্স ।'

রাহাত খানকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল, 'তুমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছো। আমরা বি. সি. আই.-কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কে. জি. বি. আজ যে বিপদে পড়েছে মাত্র ক'দিন আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও সেই একই ধরনের বিপদে পড়েছিল—তোমরা উৎসাহের সাথে তাদের সাহায্য করেছো। করোনি?'

'হ্যাঁ, মানে—করেছি।'

'তোমরা আমেরিকাকে হর-হামেশা সাহায্য করছো—করছো না?'

'হ্যাঁ···।'

'রাহাত, স্বাধীনতা যুদ্ধে কে তোমাদের সাহায্য করেছিল?'

প্রাইভেট টেলিফোনের অপরপ্রান্তে রাহাত খান চুপ করে থাক-

লেন কিছুক্ষণ। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'রানা ছাড়া আর কাউকে হলে চলে না তোমাদের?'

'না।'

'ঠিক আছে, দেখি কতো দূর কি করতে পারি…।'

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি জানতে চাইলেন, 'ইয়েস অর নো?'

চটে গেলেন রাহাত খান। বললেন, 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—না? একটু সময় তো দেবে। বুঝতে পারছো না কেন, রানার নিজস্ব একটা মতামত আছে…।'

'তুমি অর্ডার করলে তার আবার কি বলবার থাকে?'

'কথাটা তোমার মুখে মানালো না, লুদভিক,' ঝাঁঝের সাথে বললেন রাহাত খান। 'বিশেষ করে রানা সম্পর্কে যখন অনেক কিছুই জানো তুমি। ওকে আমি হুকুম করতে পারি, হুকুম মানবেও সে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা সেরকম নয়। ওর ব্যক্তিগত মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া, হুকুম করবো কোন বুদ্ধিতে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ এমন একটা অ্যাসাইনমেণ্ট রানার যেখানে করার কিছুই থাকবে না। কোথায় কোন্ এক ম্যানিয়াক আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে রানা খুঁজে বের করবে কিভাবে, বিশেষ করে তোমরা যখন তেমন কোনো সূত্রও দিতে পারছো না?'

'বুঝলাম, তুমি সন্দেহ করছো, রানা অ্যাসাইনমেণ্টটা নিতে রাজি হবে না,' বললেন জেনারেল। 'ঠিক আছে, ওকে তুমি শুধু মস্কোয় পাঠিয়ে দাও, রাজি করানোর দায়িত্ব আমাদের।'

এভাবে প্রথম বাধাটা টপকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

দ্বিতীয় বাধা ছিলো কে. জি. বি. অফিসাররা। সবাইকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন তিনি। প্রথমে আলোচনা হলো: অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব কে. জি. বি. এজেন্টদের দেয়া উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে। প্রায় সবাই একবাক্যে জানালো, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। কারণ, হয়তো দেখা যাবে, যাকে বিশ্বাস করে কাজটা করতে দেয়া হয়েছে সে বিদ্রোহীদেরই একজন। সেক্ষেত্রে আরেকজন ডালচিমস্কির জন্ম দেয়া হবে মাত্র। না, যতো দিন না বিদ্রোহীদের সবার পরিচয় জানা যায় ততোদিন রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো অ্যাসাইনমেন্ট কে. জি. বি. এজেন্টদের দিয়ে করানো ঠিক হবে না।

এরপর আলোচনা হলো, বিদেশী কোন্ ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য চাওয়া যায় তাই নিয়ে। প্রথমেই, মৃদু কণ্ঠে, সরাসরি বি. সি. আই. এজেন্ট মাসুদ রানার নামে প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। তুমুল হৈ-চৈ শুরু হলো। কে. জি. বি.-র প্রথম সারির কর্মকর্তারা সবাই মাসুদ রানার পরিচয় জানেন। তার সাহায্য নিতে কেউ তাঁরা রাজি নন।

কেন রাজি নন, এ-প্রশ্ন আর তুললেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। মিত্র দেশের আরো চার-পাঁচ জন এজেন্টের নাম বললেন তিনি। একেক বার একেক জনকে নিয়ে আলেচনা হলো।

একজন আফগান এজেন্টের পক্ষে প্রস্তাব তুললেন কর্নেল বিকারেন। কর্নেল মুস্তাকভ জানালেন, এই আফগান যুবক জীবনে কখনো আমেরিকায় যায়নি। সাথে সাথে তার নাম বাদ পড়ে গেল।

পোলিশ এজেন্ট? আমেরিকায় বার কয়েক গেছে, বুদ্ধিমান, সাহসী, নির্লোভ—কিন্তু তার ইংরেজী তেমন চোস্ত নয়। বাদ।

চেকোশ্লাভ স্পাই ? সব দিক থেকে যোগ্য সে। ভালো ইংরেজী জানে, চেহারাও অনেকটা আমেরিকানদের মতো। আমেরিকায় গেছেও বেশ ক'বার। সবাই বললো, একে দিয়েই কাজ উদ্ধার হবে। রাশিয়ার হয়ে দু'একটা অ্যাসাইনমেন্ট আগে করেছে। তাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জেনারেল কায়কোভস্কি সবাইকে হতাশ করলেন। জানালেন, তোমরা যার কথা আলোচনা করছো সে এখন হাসপাতালে। রোড অ্যাক্সিডেন্ট।

বিখ্যাত এক যুগোশ্লাভ লন টেনিস স্টারকে নিয়েও আলোচনা হলো। কিন্তু আমেরিকায় খেলার মধ্যে রয়েছে সে, সেখান থেকে ডেকে আনলে লোকের সন্দেহ হবে। প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তার ফাইনালে খেলার।

আরো এক ঘণ্টা কাটলো, সবাই যখন হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নতুন করে আবার রানার নামটা তুললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। বললেন, 'ওর সাহায্য নিতে কার কি আপত্তি আছে শোনা যাক।'

প্রথম আপত্তি জানালেন কর্নেল বিকারেন, 'রানা আমেরিকান আর ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করে···।'

'তার কারণ আমেরিকা আর ব্রিটেন তার সাহায্য চায়,' বললেন কে. জি. বি. চীফ। 'আমরা বিশেষ চাই না, কিন্তু চাইলে পাই না, একথা সত্য নয়। বেশ কয়েকবার আমরা তার সাহায্য পেয়েছি অতীতে।'

'কিন্তু এ-কথা তো ঠিক যে ওদের হয়ে কাজ করতে করতে ওদের একজন হয়ে গেছে রানা,' বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'আমরা তাকে গোপন কিছু জানালে সে হয়তো আমেরিকা বা ব্রিটেনের কাছে

ফাঁস করে দেবে।'

'রানার বিরুদ্ধে এ-ধরনের কোনো রেকর্ড আছে বলে শুনিনি। হয়তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন।'

অপেক্ষায় থাকলেন জেনারেল, কিন্তু কেউ কোনো রেকর্ডের কথা বলতে পারলেন না। 'আর কি অভিযোগ?'

কর্নেল মুস্তাকভ বললেন, 'রাশিয়ার স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছে রানা, রেকর্ড আছে।'

'কি শুনি?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে যায় সে...।'

'তা না হলে ওটা ইসরায়েলিরা নিয়ে যেতো, সেটা ঠেকাবার জন্যে কাজটা করে রানা,' ধমকের সুরে বললেন জেনারেল। 'রেকর্ড পত্রে যে অভিযোগই থাক, তা সত্যি নয়। সে-সময় যিনি কে. জি. বি. চীফ ছিলেন তিনি তাঁর নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে সমস্ত দোষ রানার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন—আমার ধারণা ছিলো, এ-সব আপনারাও জানেন।'

কর্নেল বিকারেন বললেন, 'যে-সব কারণে অন্যান্য এজেন্টরা বাদ পড়লো, সেই একই কারণে মাসুদ রানাও বাদ পড়তে পারে। সে কোথায় আছে আমরা জানি না, এই মুহূর্তে নিজেদের কোনো কাজে ব্যস্ত কিনা তাও আমাদের জানা নেই...।'

এতো সহজে দ্বিতীয় বাধাটা টপকাতে পারবেন, ধারণা ছিলো না জেনারেল কায়কোভস্কির। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'রাহাত খানকে আগেই আমি রাজি করিয়েছি। রানা কোথায় আমি জানি। ডাকলেই মস্কোয় চলে আসবে সে। কিন্তু কাজটা করতে রাজি হবে

কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ।'

রানাকে রাজি করানো, তৃতীয় এবং শেষ বাধা। এই মুহূর্তে সেই বাধার সামনেই পড়েছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

রানার প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল বললেন, 'আমরা চাই, ডালচি-মস্কিকে খুঁজে বের করুন আপনি, মিঃ রানা।'

'খুঁজে বের করুন, এবং খুন করুন,' হিংস্র ভঙ্গিতে যোগ করলেন কর্নেল বিকারেন।

'আর খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিন আমাদের।' পাকা চুলে আঙুল চালালেন জেনারেল। 'সময় নেই, মিঃ রানা, সময় নেই। দেরি করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডালচিমস্কি!'

রানার চোখে পলক পড়ছে না।

কর্নেল ভাবছেন, রানা যদি আমেরিকানদের হাতে ধরাও পড়ে, রাশিয়া অস্বীকার করে বলবে, তার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

জেনারেল ভাবছেন, ডালচিমস্কি এভাবে যদি একের পর এক টেলি-বম ফাটাতে থাকে, আমেরিকা জানবে বিনা উস্কানিতে রাশিয়া তাদেরকে ধ্বংস করার প্ল্যান করেছে। পাল্টা আঘাত হানবে তারা…।

'আপনারা আমাকে সংখ্যা জানাননি,' বললো রানা। 'আপনা-দের ক'জন ডীপ-কভার এজেন্ট রয়েছে আমেরিকায়?'

কর্নেল বিকারেন তাড়াতাড়ি বললেন, 'অনেক…এই ধরুন ত্রিশ-চল্লিশ জনের মতো।'

'একশো ছত্রিশ জন, আনাতোলি,' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন জেনারেল। 'গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে, একশো ছত্রিশ জন।'

'ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করতে পারলে এদের ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' শুরু করলেন কর্নেল বিকারেন। 'টেলিফোনে কোড সিগন্যাল না পাঠালে ওরা কেউ বিপজ্জনক নয়...।'

'একান্ত যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে ওদের নাম-ঠিকানা আপনাকে জানানো যেতে পারে।' একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে ওর মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'আপনার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ, জেনারেল,' তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। 'কিন্তু জানেন তো, অনেকগুলো রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দুশো বিশ মিলিয়ন মানুষ বাস ক'র তিন মিলিয়ন স্কয়্যার মাইলের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে—বলতে পারেন, আপনাদের ডালচিমস্কিকে কোথায় আমি খুঁজবো?'

ওঁরা কেউ জবাব দিলেন না।

'আপনারা বোধহয় ধরে নিয়েছেন আমি একজন জাদুকর, জেনারেল।'

প্রসঙ্গটা আপাততঃ কৌশলে এড়িয়ে গেলেন কে. জি. বি. চীফ। হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুকনো আলাপ আর কতোক্ষণ, আনাতোলি?' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে? কাউকে ডাকো, লাঞ্চটা এখানেই সেরে নিই। ঠিক আছে, মিঃ রানা?'

ঝট্ করে রানার সামনে সিগারেটের একটা প্যাকেট ধরলেন কর্নেল বিকারেন। রানার প্রিয় ব্র্যাণ্ড। 'ততোক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিন, মিঃ রানা।'

তবু রানা হাসতে পারলো না।

পাঁচ

রানাকে মস্কোয় পাঠাবার আগে মেজর জেনারেল রাহাত খান বলে দিয়েছেন, বড় কোনো বাধা না থাকলে কাজটা ওদের করে দিয়ো।

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে জেনারেল আর কর্নেলের সাথে লাঞ্চ খেতে বসে গোটা ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখলো রানা। বড় কোনো বাধা এখন পর্যন্ত দেখছে না ও। কিন্তু তবু কাজটা নিতে মন চাইছে না ওর। বিশাল মরুভূমিতে একটা পিন হারিয়ে গেলে সেধে কে সেটা খোঁজার দায়িত্ব নিতে চায়?

ডালচিমস্কি যে সত্যি সত্যি গুরুতর একটা হুমকি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একশো ছত্রিশটা সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে পারে সে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কিভাবে, কোত্থেকে তাকে খুঁজে বের করবে রানা?

তারপর ভাবলো, সে যদি কাজটা না করে তাহলে কি হবে? বসের বন্ধু, কে. জি. বি. চীফ অসন্তুষ্ট হবেন। অন্য কারো ঘাড়ে চাপানো হবে অ্যাসাইনমেন্ট। তাকেও এই একই সমস্যায় পড়তে হবে—কোথায় খুঁজবে সে ডালচিমস্কিকে? খুঁজে বের করতে হলে

বহু লোককে ডালচিমস্কি এবং টেলি-বমের কথা বলতে হবে, এবং ভুল লোককে বললে এফ. বি. আই. বা সি. আই. এ. টের পেয়ে যাবে ব্যাপারটা। রুশ এজেন্ট যদি ধরা পড়ে, আমেরিকানরা তার কাছ থেকে ঠিকই একশো ছত্রিশ জনের নাম-ঠিকানা আদায় করে নেবে।

একশো ছত্রিশ জন নিরীহ মানুষ। তারা জানে না তারা ডীপ-কভার এজেন্ট। চোদ্দ বছর ধরে সুন্দর, শান্তিময় জীবনযাপন করছে সবাই। কেউ কেউ বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে। হঠাৎ টেলিফোনে একটা কোড সিগন্যাল পেয়ে হয়ে উঠবে মূর্তিমান বিভীষিকা, শুরু করে দেবে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। তারা নিজেরাও প্রায় সবাই মারা পড়বে।

মনে মনে শিউরে উঠলো রানা। অন্তত এই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে কাজটা নেয়া উচিত ওর। এদের বাঁচানো সম্ভব হলে বড় একটা মানবিক কাজ করা হবে।

লাঞ্চের পর কফির কাপে চুমুক দিয়ে রানাই নতুন করে প্রসঙ্গটা তুললো, 'আমেরিকায় আপনাদের অনেক এজেন্ট আছে, আমি কি প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিতে পারবো ?'

মনে মনে ভারি খুশি হলেও জেনারেল কায়কোভস্কির চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। রানার কথাতেই বোঝা গেছে, সে রাজি। 'কিন্তু আমি যতোদুর জানি,' অবাক স্বরে বললেন তিনি, 'আপনি একা কাজ করতে পছন্দ করেন, মিঃ রানা ?'

'তা করি,' বললো রানা। 'কিন্তু অল্প সময়ে ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা আমার একার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'দেশে বা দেশের বাইরে পরিস্থিতি এখনো নাজুক, মিঃ রানা।

স্ট্যালিনপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের কথা নিশ্চয়ই আপনি আপনার বসের মুখ থেকে শুনেছেন···।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল।

কর্নেল বললেন, 'কে. জি. বি. এজেন্টদের সাহায্য নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তারচেয়ে এফ. বি. আই.-এর সাহায্য চাওয়াও বোধহয় ভালো।' বোঝা গেল এটা তাঁর রাগ আর ক্ষোভের কথা।

'আমার বিশ্বাস আরো বেটার কোনো আইডিয়া আপনি পেয়ে যাবেন, মিঃ রানা,' আস্থা প্রকাশ করলেন জেনারেল। 'আমরা চাই না আপনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানুক। এবং আপনাকে সব ক'থা জানাবার আগে আমরা চাইবো, একটা দাঁতের ভেতর আপনি সায়ানাইড পিল রাখবেন।'

'কেন?'

'আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি, মিঃ রানা,' আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'বিশ্বাস করি, আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়লেও সহজে আপনি মুখ খুলবেন না। কিন্তু সব মানুষেরই রেজিস্ট্যান্সের একটা সীমা আছে। ওদের ইন্টারোগেশন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানি। যে-কোনো মানুষকে ওরা কথা বলাতে পারে।'

'আপনারা চান ধরা পড়লে আমি আত্মহত্যা করবো?'

'চাই এবং জানি আপনি তা করবেন। জানি বলেই আপনার সাহায্য চেয়েছি আমরা, মিঃ রানা। সম্ভব হলে আজই অপারেশন করে আপনার একটা দাঁত তোলা যেতে পারে, তার জায়গায় নতুন একটা···।'

'সায়ানাইড পিল সহ কৃত্রিম একটা দাঁত আমার আছে,' বললো

রানা।

রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা। তারপর মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'গুড।'

'আপনি সরাসরি কে. জি. বি. রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করবেন, মিঃ রানা,' বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর।

'অধীনে মানে?' একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

তাড়াতাড়ি রানার দিকে আরেকবার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল বিকারেন। 'মানে যোগাযোগ রাখবেন আর কি! দরকার হলে আপনাকে তিনি পরামর্শ দেবেন, আপনি তাঁর কাছে রিপোর্ট করবেন··· ।'

মাথা নাড়লো রানা। 'আমি স্বাধীনভাবে কাজ করবো,' শান্তভাবে বললো ও।

কর্নেল এবং জেনারেল দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'আপনাদের জানার কথা, ফিল্ডে কারো অধীনে আমি কাজ করি না,' আবার বললো রানা। 'আমার ওপর আপনাদের পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকলে··· কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো ও।

'ব্যাপারটা ঠিক তা না, মিঃ রানা,' বললেন বিকারেন। 'ভেবে দেখুন না··· ।'

'ভেবে দেখার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে। আপনারা চাইছেন কে. জি. বি. রেসিডেন্ট আমার ওপর নজর রাখুক, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করুক। কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থেই আমি কারো সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই না।'

'প্লিজ, মিঃ রানা!' আবেদনের সুরে বললেন কর্নেল। 'আপনি

কতোদুর এগোলেন, আপনার সাহায্য দরকার আছে কিনা, এ-সব আমাদের জানতে হবে না ?'

'সেক্ষেত্রে মস্কো থেকে রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন ...।'

'ভেবে আপনারা দেখুন। আমি চাই না কে. জি. বি. রেসিডেণ্ট জানুক আমি কোথায়, কখন, কি চেহারা নিয়ে আছি।'

আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন ওঁরা। কর্নেলের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল।

'ঠিক আছে, তাই হবে,' রানার প্রস্তাব কবুল করে বললেন কর্নেল।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে জেনারেল বললেন, 'তবে, আমাদের একজন এজেণ্ট আপনার সাথে থাকবে। প্লিজ, মিঃ রানা, আমাকে আগে শেষ করতে দিন। আপনার কোনো ব্যাপারে ভুলেও নাক গলাবে না সে। প্রয়োজনে যে-কোনো কাজে তাকে আপনি নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবেন। মেয়েটা খুবই স্মার্ট এবং বিশ্বস্ত। একেবারে একা থাকবেন, একজন সঙ্গিনী থাকলে মন্দ কি ?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু যদি দেখি আমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাকে আমি বাদ দিতে পারবো তো ?'

'অবশ্যই, অবশ্যই বাদ দিতে পারবেন,' সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন জেনারেল। 'বিশ্বস্ত, কিন্তু তবু তাকেও আপনি সব কথা বলবেন না—টেলি-বমের কথা তো নয়ই। জানি, একা কেন, এক হাজার

লোকের পক্ষেও কাজটা কঠিন। কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই, মিঃ রানা। ডালচিমস্কি এবং টেলি-বম্ব সম্পর্কে আপনাকে না জানা-লেই নয়, তাই জানাচ্ছি। আর কাউকে জানাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো রানা। বিড়বিড় করে বললো, 'মিশনটা পাগলামি ছাড়া কি বলুন! রাজি হচ্ছি শুধু ওই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে...।'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। আমাদের প্রিমিয়ারের কাছ থেকে টেলি-বম বুকটা আনানো হয়েছে, মিঃ রানা। অন্যান্য কাগজ-পত্র সহ পাশের কামরায় আপনার জন্যে রাখা আছে সেটা।'

'আর তিন নম্বর কপিটা?' জানতে চাইলো রানা। 'যেটা রেড আর্মি চীফের সেফে আছে? আপনারা বলেছেন, গ্রু-র লোকজন পাহারা দেয় ওটাকে।'

'আপনি বোধহয় আসলে জানতে চাইছেন আমাদের মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ডালচিমস্কির ব্যাপারটা জানে কিনা, তাই না, মিঃ রানা?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। গম্ভীর। 'হ্যাঁ।'

খুব সাবধানে উত্তর দিলেন জেনারেল, 'ওরা এখনো কেউ কিছু জানে না। জানার পর কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে পরামর্শ করবে। মোট কথা, ওদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কোনো দরকার নেই আপনার।'

'কখন রওনা হচ্ছি আমি?' চেয়ার ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কাল সকাল পাঁচটায় আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নেয়া

হবে।'

পাশের কামরার দরজার দিকে এগোলো রানা, কর্নেল বিকারেন ওর পাশেই রয়েছেন। পিছন থেকে জেনারেল কায়কোভস্কি আবার বললেন, 'সাথে ব্যাগ-ট্যাগ নেয়ার দরকার নেই, মিঃ রানা।'

দরজার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো রানা। 'লাগেজ ছাড়া কেনেডি এয়ারপোর্টে নামলে লোকে সন্দেহ করবে না?'

'আপনি কেনেডি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন না। গুডবাই, কমরেড, অ্যাণ্ড গুড হান্টিং।'

দরজা খুলে ধরলেন কর্নেল, পাশের কামরায় ঢুকে পড়লো রানা।

ডেস্কের কাছে ফিরে এসে কর্নেল বিকারেন জেনারেলকে বললেন, 'কি যে ঘটতে যাচ্ছে জানি না। একেবারে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া কি উচিত হচ্ছে?'

'ওকে দিয়ে কাজটা করাতে হলে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল, 'এছাড়া উপায় নেই। মেয়েটাকে সব কথা জানাবার ঝুঁকি সত্যি আমরা নিতে পারি না।'

'কিন্তু রানার গতিবিধি সম্পর্কে রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করতে পারবে না সে?'

'পারবে, তবে উচিত হবে না। আসলে নির্ভর করবে মেয়েটার ওপর।' নতুন একটা রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট ধরালেন জেনারেল। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, আনাতোলি।'

'বলুন।'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে জেনারেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের সাথে আমরা কোনো পরামর্শ

করলাম না। গ্রু-র (জি. আর. ইউ.) নতুন চীফ টেলি-বম সম্পর্কে কতোটুকু কি জানে ঠিক বলতে পারছি না। তবে ডালচিমস্কি যে আমাদের খাতাটা নিয়ে পালিয়েছে, এ-কথা এখনো বোধহয় তার জানা নেই…।'

'আমেরিকায় যা ঘটছে সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই রিপোর্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক। হয়তো নতুন বলেই তার সাথে টেলি-বমের সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছেন না।'

'যতো নতুনই হোক, আরো দু'একটা ঘটনা ঘটলে ঠিকই টের পেয়ে যাবে। তখন যে কি ঘটবে তাই ভাবছি।'

'যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, জেনারেল কমরেড,' বললেন কর্নেল। 'এখন রানার ব্যাপারটা ভাবুন। ও কি পারবে? ধরুন, ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে না পারে… ।'

'কাজটা কঠিন নয়, আনাতোলি, অসম্ভব—অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি।' চোখ বুজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি। 'সেজন্যেই রানা রানা করে জান দিচ্ছিলাম। যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে। এ-ও আমার একটা বিশ্বাস। কোনো সূত্র নেই, কারো কোনো সাহায্য নেয়া যাবে না…,' এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

'ট্রিপটা সম্পর্কে সব কথা ওকে বললেই বোধহয় ভালো হতো…।'

'বলবে বৈকি, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে…।'

'কিন্তু আমাদের প্ল্যান যদি পছন্দ না করে? যদি বেঁকে বসে?'

'বেঁকে বসবে না,' এতোক্ষণে হাসি দেখা গেল জেনারেলের মুখে। 'শুনলে না কি বললো? শুধু একশো ছত্রিশজনের কথা ভেবে

যেতে রাজি হয়েছে। ওর ডোশিয়ে পড়োনি ? মানবিক দিকগুলো খুব বড় করে দেখে··· ।'

'তাহলে তো ওর ঘাড়ে আমরা জোর করে রেসিডেন্টকে চাপিয়ে দিতে পারতাম !'

'তা পারতাম না,' বললেন জেনারেল। 'এ-ধরনের ব্যাপারে আপোষ করা ওর ধাতে নেই।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন কর্নেল বিকারেন। 'আমি আমেরিকানদের কথাও ভাবছি, জেনারেল কমরেড।'

'হ্যাঁ, আমিও ওদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। ঘটনাগুলো যে অ্যাক্সিডেন্ট নয়, আগে বা পরে ঠিকই ওরা বুঝে ফেলবে। তখন কি হবে ? কি করবে ওরা ?'

মোটামুটি তিন হাজার চারশো বাষট্টি মাইল দূরে—যদি পোলার রুট ধরে হিসেব করা হয়—টি এইট্টি-থ্রি নামে পরিচিত বিল্ডিঙের তিন তালায় বসে চুরুট ফুঁকছে মেজর জেফ অ্যাডামস। এ-ধরনের আরো অনেক বিল্ডিং আছে, সবগুলোকে টেমপো বলা হয়, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল এগুলো, তার মধ্যে আজও কয়েকটা খাড়া হয়ে আছে। ভার্জিনিয়ার এই টেমপোটা এয়ারফোর্স দখল করে আছে, স্পেশাল ইনভেস্টিগে-শন-এর কয়েকটা ল্যাবরেটরি রয়েছে এখানে। জেনারেল কায়কো-ভস্কিরমতো মেজর অ্যাডামসও রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট চুরুট খায়, কিন্তু কিউবার এই চুরুট আমেরিকায় স্মাগল হয়ে আসে, ফলে রুশ জেনারেলের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিতে হয় আমেরিকান মেজরকে।

আপনমনে মাথা ঝাঁকালো মেজর। নো-নাইন, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

টাইমিং মেকানিজম দেখার পর জিনিসটা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারা গেল। ফসফরাসের অবশ্য বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই, কারণ রুশ ব্লকের অনেক ইন্টেলিজেন্সই এ-ধরনের ডিভাইসে ফসফরাস কম্পাউণ্ড ব্যবহার করে। আসলে বিশেষ এই টাইমিং ডিভাইসটা শুধু মাত্র নো-নাইনেই ব্যবহার করা হয়। উনিশ শো আটান্ন সালে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ন্যাটো হেডকোয়ার্টারে একটা মিটিঙে বসেছিল, সেই মিটিঙে এই স্যাবোটাজ ডিভাইসের নামকরণ করা হয় নো-নাইন। নো-র মানে হলো, মস্কোর পুব দিকে নোগিনস্ক প্ল্যান্টে তৈরি করা হয়েছে অস্ত্রটা, আর নাইন শব্দটার অর্থ এই সিরিজে এর আগে আরো আটটা সংস্করণ আছে।

'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,' জেফ অ্যাডামস সরলভাবে স্বীকার করলো।

উনিশ শো সাতষট্টি সালের পর রাশিয়ার বাইরে কেউ এই নো-নাইন দেখেনি, ভিয়েৎনাম যুদ্ধেও এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান হেড, মেরিল্যাণ্ডে নেভির এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল স্কুল রয়েছে, সেখানে শো-কেসের ভেতর এক জোড়া নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, তাও স্রেফ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ওগুলো রাখা হয়েছে ওখানে।

'আমি বুঝছি না, হয়তো অন্য কেউ বুঝবে,' আপনমনে আবার বিড়বিড় করলো মেজর অ্যাডামস। ভাবলো, একটা রিপোর্ট লিখে পেন্টাগনের এ-টু-তে পাঠিয়ে দেয়া যাক, ওখানে অনেক বড় বড়

মাথা আছে, তারা হয়তো রহস্যটা ভেদ করতে পারবে। কিংবা তারাও হয়তো তার মতো গালে হাত দিয়ে ভাববে, এ কিভাবে সম্ভব ? অগাস্টার ফাইটার বেসে কয়েকটা নো-নাইন আসে কি করে ? আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ফুয়েল ট্যাংকের পাশেই পাওয়া গেছে ওগুলো —এলো কোত্থেকে ?

ছয়

ভোর পাঁচটায় রানাকে গাড়িতে তুলে নিলেন কর্নেল বিকারেন। কে. জি. বি. সাধারণত মস্কোভা ব্যবহার করে, তবে ছোটো একটা পোবেদা নিয়ে এলেন কর্নেল। রাজধানীর ঘুম ভাঙেনি, রাস্তা-ঘাট প্রায় নির্জন। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পথে মাত্র দশ-বারোটা গাড়ি দেখলো রানা।

'পুরো তালিকাটা মুখস্থ করেছেন, তাই না ?' প্রাক্তন পদাতিক জিজ্ঞেস করলেন। সাবধানী লোক তিনি, স্পীড লিমিটের চেয়ে পাঁচ কিলোমিটার কম গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। সমস্ত ব্যাপারেই শুধু খোঁজ নিয়ে ক্ষান্ত হন না, আবার খোঁজ নেন।

'হ্যাঁ। সবগুলো নাম, ঠিকানা, আর টেলিফোন নম্বর।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। 'সায়ানাইড পিলটা আরেক-বার চেক করে নিয়েছেন তো?'

হাসি চেপে রানা বললো, 'নিয়েছি। তবে আপনাদের এই কাজটা করতে গিয়ে মরার আগ্রহ আমার নেই।'

'দুঃখিত, তা ঠিক বোঝাতে চাইনি আমি, মিঃ রানা। আশা করি সে-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে না। বুঝতেই তো পারেন, আমরা খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকবো। আপনার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ঝুঁকির। আমেরিকানদের হাতে আপনি ধরা পড়তে পারেন। যদি ধরা পড়েনই, আমরা আশা করবো তালিকাটা ওরা পাবে না।'

'পাবে না,' কথা দিলো রানা। 'আমি জানি, তালিকাটা আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন বিকারেন, 'মেয়েটা··· মানে, খুব সুন্দরী। অন্য কিছু মীন করছি না, বলতে চাইছি, ওর সঙ্গ আপনার ভালো লাগবে। আমেরিকান মেয়ে এতো প্র্যাকটি-কাল হতে পারে, ভাবা যায় না।'

'ভালো হতো যদি ওর সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য দিতে পার-তেন···।'

'আপনাকে যা বলেছি, তার বেশি আমরা বিশেষ কিছু জানি না, মিঃ রানা,' এয়ারপোর্টের দিকে বাঁক নিয়ে বললেন কর্নেল। 'ওখানে পৌঁছে অবশ্য জানতে পারবেন, কিন্তু তাহলে কে. জি. বি. রেসি-ডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে। মেয়েটার ডোশিয়ে শুধু তার কাছেই আছে।'

সামনে ওরা হ্যাঙ্গারের ছাদ দেখতে পেলো।

'আমার সীটটা জানালার ধারে হলে ভালো হয়,' অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে বললো রানা।

হেসে ফেললেন কর্নেল। 'আপনার জন্যে তারচেয়ে ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিঃ রানা। আপনার পছন্দমতো যে-কোনো জানালার ধারে বসতে পারবেন।'

বড়সড় ইলিউশিন জেটে উঠে রানা আবিষ্কার করলো, কর্নেল ঠাট্টা করেননি। প্লেনে আর কোনো আরোহী নেই। গোটা প্লেনটা রানা আর ওর লাগেজের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। দু'সারি সিটের মাঝখানের প্যাসেজে দুটো লেদার স্যুটকেস দেখলো রানা, সম্ভবত আমেরিকান কাপড়চোপড় আর অতিরিক্ত কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে ওগুলোয়। একটা স্যুটকেসের গায়ে দু'প্রস্থ টেপ দিয়ে এক্স অক্ষরটা তৈরি করা হয়েছে।

কেবিন লাউডস্পীকার ঘরঘর করে উঠলো, তারপরই একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তিন মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করবো আমরা।' চোখ তুলে তাকালো রানা। যেন হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো, প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে কোথাও স্টুয়ার্ড বা স্টুয়ার্ডেস নেই। সম্পূর্ণ একা সে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আয়োজনটা এমন ভাবে করা হয়েছে এয়ারপোর্টের কোনো কর্মী বা প্লেনের কোনো ক্রু যাতে ওর চেহারা দেখতে না পায়। সিকিউরিটি, সন্দেহ নেই।

সাবলীল ভঙ্গিতে টেক-অফ করলো জেট, একবার চক্কর দিয়ে পশ্চিম মুখো হলো। বিশ মিনিট পর আবার শোনা গেল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'বারো নম্বর সিটে দুটো থার্মোস কনটেইনার আর একটা ফুড বক্স আছে।'

থার্মোস কনটেইনারে চা আর কফি পাওয়া গেল। ফুড বক্সে স্যাণ্ডউইচ আর সীল করা একটা এনভেলাপ। এনভেলাপের ভেতর থেকে বেরুলো আমেরিকান সিগারেট, ম্যাচ-বক্স, আর একটা চিঠি। কফি খেয়ে চিঠিটা পড়লো রানা। তথ্য এবং পরামর্শ-গুলো মনে গেঁথে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা, বারো নম্বর সিটের অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরালো চিঠিতে। সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

ঘুম ভাঙলো তিন ঘণ্টা পর স্পীকারের ঘর ঘর আওয়াজে।

'আপনি এখন খেয়ে নিতে পারেন। আমাদের শিডিউল ঠিক আছে, নিচে নামতে শুরু করার এক ঘণ্টা আগে আপনাকে আমরা সতর্ক করবো। বর্তমান অলটিচ্যুড একত্রিশ হাজার ফিট, বাতাসে অস্বাভাবিক কোনো আলোড়ন নেই।'

একজোড়া স্যাণ্ডউইচের সাথে এক কাপ কফি খেলো রানা। খালি কেবিনের চারদিকে তাকালো, কাঁধ ঝাঁকালো আপনমনে, তারপর সিট ছেড়ে টয়লেটের দিকে এগোলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার ঘর ঘর করে উঠলো স্পীকার, 'এক ঘণ্টা···আর এক ঘণ্টা পর আমরা নিচে নামতে শুরু করবো।'

এক্স চিহ্নিত স্যুটকেসটা খুলে প্যারাস্যুট বের করলো রানা। পরিচিত মডেল, আগেও কয়েকবার ব্যবহার করেছে ও। দ্বিতীয় স্যুটকেস থেকে বেরুলো স্কুবা গিয়ার। নিশ্চয়ই ওর গায়ের মাপ মতো হবে। এ-সব ব্যাপারে কর্নেল বিকারেনের ওপর ভরসা করা যায়।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। স্যুটকেস থেকে বের করে পাশের সিটে রাখলো প্যারাস্যুট। গা থেকে একটা করে কাপড় খুলে ভাঁজ কর-

লো, যত্ন করে রেখে দিলো সদ্য খালি স্যুটকেসে। পরনে যখন শুধু আণ্ডারপ্যান্ট, কেবিনের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে হেসে ফেললো ও। এটাই বোধহয় প্রথম এবং শেষ রেগুলার অ্যারোফ্লট ফ্লাইট, মস্কো থেকে মনট্রিঅল পর্যন্ত মাত্র একজন আরোহীকে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিচ্ছদটাও কোমর থেকে নামিয়ে ফেললো, দিগম্বর হয়ে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেললো বার কয়েক। স্কুবা গিয়ার পরে একটা সিগারেট ধরালো। ঠিক মতোই ফিট করেছে, কোনো অংশই রাশিয়ায় তৈরি নয়। লেবেলে ইটালিয়ান কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে, সারা দুনিয়ায় ওরাই স্কুবা গিয়ার সরবরাহ করে, সবচেয়ে বড় খরিদ্দার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

'নিচে নামতে আর ত্রিশ মিনিট। ত্রিশ। বিশেষ অলটিচ্যুডে দশ মিনিট উড়বো আমরা। দশ।'

খাঁটি এয়ারলাইনের ভাষা। সহজ করে সরাসরি কিছু বলা হয় না। সন্দেহ নেই, নর্থ আটলান্টিক বরাবর আঠারো শো ফিট কমার্শিয়াল ফ্লাইটের জন্যে বিশেষ অলটিচ্যুড বটে, কিন্তু কথাটা অন্য ভাবেও বলা যেতো। একটা প্লাস্টিক ব্যাগে কোল্ট পয়েন্ট থ্রি-টু ভরে নিলো রানা, গিঁট দিয়ে মুড়লো মুখটা, তারপর সেটা আরেকটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরলো। দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ একই ভাবে বন্ধ করে গোটা প্যাকেটটা শোল্ডার-পাউচে ঢুকিয়ে দিলো, বেল্ট টেনে বন্ধ করলো পাউচের গলা। এরপর ওয়াটার প্রুফ ডাইভার ওয়াচটা পরলো হাতে।

ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না। বিসমিল্লাতেই পটল তুলতে পারে মাসুদ রানা। অনেকগুলো যদি-র ওপর নির্ভর করছে ওর আমেরিকায় পৌঁছানো।

যদি প্যারাস্যুট ঠিকমতো খোলে।

যদি হারনেসের সাথে আটকানো মিনি ট্র্যান্সমিটারটা কাজ করে।

যদি ওরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারে।

প্ল্যানটা হলো, বড়সড় প্লেনটা আঠারো শো ফিট পর্যন্ত নামবে, তারপর যতোটা সম্ভব স্পীড কমিয়ে রানাকে লাফ দেয়ার সুযোগ করে দেবে পাইলট। দরজাটা তার দিয়ে আটকানো আছে, কাজেই কয়েক ফিটের বেশি খুলবে না, রানা লাফ দেয়ার পর দু'জন ক্রু যাতে ঠেলে আবার বন্ধ করতে পারে সেটা। দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করবে প্লেন, ত্রিশ হাজার ফিট উঠে বাকি পঁচাত্তর মাইল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে কানাডিয়ান উপকূলে। মিলিটারী এয়ারক্রাফট হলে রানার জন্যে লাফ দেয়া সহজ হতো, কিন্তু মন্ট্রিঅলে রেড এয়ারফোর্সের একটা দূর পাল্লার মিলিটারী ট্র্যান্সপোর্ট বা বম্বারের উপস্থিতি বিপুল মার্কিনী এবং কানাডিয়ান কৌতূহলের উদ্রেক করতো। কাজেই ঝুঁকিটা রানার ওপর দিয়ে যাচ্ছে—প্লেনের লেজে বাড়ি খেয়ে পটল তুলতে পারে ও।

'নামতে আর পাঁচ মিনিট। কেবিন প্রেশার কমতে যাচ্ছে।'

হাত দিয়ে বুক স্পর্শ করলো রানা, ভুয়া পরিচয়-পত্র ইত্যাদি সহ ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা নিতে ভুল করেনি। যে দরজাটা ব্যবহার করবে তার কাছাকাছি একটা সিটে বসলো ও। অনুভব করলো, প্রায় ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে প্লেন। কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ একটানা শব্দ হলো—বদলে যাচ্ছে কেবিন প্রেশার।

'বিশেষ অলটিচ্যুডে নেমেছি আমরা···লেভেল অবস্থায় রয়েছি ···কোর্স আর শিডিউল ঠিকঠাক আছে।'

‘ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করে বললো রানা, কিছু একটা বলতে পেরে অকারণেই খুশি হয়ে উঠলো মনটা।

প্রতি মুহূর্তে স্পীড কমছে প্লেনের। লাফ দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে। দ্রুত, দক্ষ হাতে প্যারাস্যুট পরলো ও; হারনেস আর স্ট্র্যাপগুলো কয়েকবার করে পরীক্ষা করে নিলো। খালি কেবিনটা আরেকবার, শেষবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো ও। হাতল ধরে ঘোরালো ধীরে ধীরে।

দুই তৃতীয়াংশ খুলে গেল দরজা। তীব্র বাতাস বিরামহীন হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাত করছে ওকে। ঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলালো রানা।

এখনই সময়।

ঠোঁট নড়ে উঠলো, লাফ দিলো ও। লেজের সাথে ধাক্কা খেলো না। পাঁচ পর্যন্ত গুণলো। টান দিলো রিপ-কর্ডে। একটা ঝাঁকি খেলো, হুস করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে, সেই সাথে খুলে গেল প্যারাস্যুট।

নিচে কোল পেতে আছে সাগর। সাগরের রঙ কালচে-সবুজ। ঝপাৎ করে পড়লো রানা। ছ্যাঁকা খেলো—হিমশীতল। রাবার স্যুট ভেদ করে কাঁপিয়ে দিলো হাড়। পা ছুঁড়ে চারদিকে পানি ছিটাতে লাগলো রানা। বিষম খেলো, লোনা স্বাদে ভরে গেল মুখের ভেতরটা, কোনো রকমে চেপে রাখলো বমি বমি ভাবটাকে। খক খক করে কাশলো বার কয়েক।

মিনি ট্র্যান্সমিটারের বোতাম টিপলো রানা। রিসিভারে ওর লোকেশন ধরা পড়বে। ব্লিপের রেঞ্জ পনেরো মাইল, এর মধ্যে ওরা থাকলে হয়। স্কুবা গিয়ার পরে থাকলে কি হবে, এই কনকনে শীতে

বিশ মিনিটও বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

পুলকের একটা ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরে। ওই তো, আধ মাইল দূরে রয়েছে ওরা—শুধু কোনিং টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে। রুশ সাবমেরিন। নিউক্লিয়ার। পানি কেটে এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

সত্যি রুশ তো?

ওটা আরো কাছে আসার পর কোনিং টাওয়ারে এক জোড়া মাথা দেখতে পেলো রানা। মানুষের আকৃতি, কিন্তু অবয়ব দানবের। আরো কাছাকাছি আসার পর বোঝা গেল, ওদের চোখে বায়নোকিউলার রয়েছে। শীতে হি হি করছে রানা, ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের সাথে ডেকে উঠে এলো শরীরটা। মইটা কোনিং টাওয়ারের গা ঘেঁষে মাথার দিকে উঠে গেছে। মই বেয়ে খানিক দূর উঠতে হলো রানাকে, লোক দু'জন ওকে ধরে ফেললো।

রানাকে টাওয়ারে উঠিয়ে এনে এক পাশে সরে দাঁড়ালো ওরা, হ্যাচ কাভার সরালো। মই বেয়ে সাবমেরিনের ভেতরে নামলো রানা।

খোলের ভেতরটা গরম। তবু কাঁপুনি থামানো গেল না।

'আপনি সুস্থ?' একজন প্রশ্ন করলো।

রানা কিছু বলার আগেই অপর লোকটা হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে মাইক্রোফোন/টেলিফোনে বললো, 'আরোহী নিরাপদে পৌঁচেছে। হ্যাচ বন্ধ।' প্রায় সাথে সাথে ডাইভ দিলো সাবমেরিন। একটু পর রানা যখন ক্যাপটেনের হাত থেকে ধূমায়িত কফির কাপ নিচ্ছে, ওদের বাহন তখন আটলান্টিকের সারফেস থেকে নব্বই

ফিট নিচে নেমে এসেছে।

রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভ ব্যাপারটা দেরিতে জানলেন, কিন্তু খুব বেশি দেরিতে নয়। তাঁর মস্ত একটা গুণ, এক ঢিলে একাধিক পাখি মারতে পারেন, এবং চট্ করে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান বলে অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব রেডি করে ফেলেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিন মিনিট ভাবলেন তিনি, তারপরই কে. জি. বি.-র বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্রেমলিনে ডাক পড়লো, আরো আধ ঘণ্টা পর বেজার চেহারা নিয়ে হাজির হলেন জেনারেল কায়কোভস্কি আর কর্নেল বিকারেন। রেড আর্মি চীফ মার্শাল লিউ ওনায়েভ ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মার্শাল ওনায়েভ মিষ্টভাষী নন, তাঁর হুল ফোটানো মন্তব্য আর বদ মেজাজকে ভয় পায় না এমন লোক সেনাবাহিনী বা ইন্টেলিজেন্সে নেই। ওঁদের ওপর ভয়ানক খেপে আছেন ভদ্রলোক। এমনকি অফিস কামরায় ঢোকার পর ওঁদের তিনি বসতে পর্যন্ত বললেন না।

'টেলি-বম,' কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কে. জি. বি. অফিসাররা একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

'স্কীমটা রাম-ছাগলের মাথা থেকে বেরিয়েছিল,' গম গম করে উঠলো মার্শালের কণ্ঠস্বর। তিনি মাথা নাড়তে, চোখের চশমায় ঝিক্ করে উঠলো বিকেলের রোদ।

'মার্শাল কমরেড, তখনকার রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ স্কীমটা অনুমোদন করেছিলেন,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায়! কিংবা খবর নিলে জানতে পারবেন, বুড়ো বয়েসে নাতনীর বয়েসী কারো সাথে প্রেম করছিলেন। খানিক আগে প্রিমিয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমার সাথে একমত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তার আগে শুনতে চাই, এই বিপর্যয় কাটাবার জন্যে আপনারা কি করতে চাইছেন?'

'বেঈমানকে ধরার জন্যে অত্যন্ত যোগ্য একজন এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে...।'

'যোগ্য এজেন্ট? কি করে বুঝলেন সে স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীদের একজন নয়? ভেবেছেন কোনো খবরই আমরা রাখি না? অস্বীকার করতে পারবেন, কে. জি. বি. চুরমার হয়ে গেছে?'

'সে কে. জি. বি. এজেন্ট নয়,' ঠাণ্ডা গলায় জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন। 'বি. সি. আই. এজেন্ট মাসুদ রানা...।'

'অর্থাৎ তার সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না। তার ওপর আপনাদের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই।' তারপরই বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন মার্শাল ওনায়েভ। 'কি চান কি আপনারা? দেশটাকে বিক্রি করে দেবেন?'

জেনারেল কায়কোভস্কি চুপ করে থাকলেন।

ওঁদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল। তারপর হঠাৎ পিস্তলের মতো আঙুল তাক করলেন কর্নেল বিকারেনের দিকে। 'বিকা...বিকারেন, তাই না? সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালের দিকে আপনি আমাদের একজন ক্যাপটেন ছিলেন, ঠিক?'

'মার্শাল কমরেডের স্মরণশক্তি··· ।'

'ব্যস, ব্যস। আপনি ভালো একজন সৈনিক ছিলেন, বিকারেন। এখানে রাম-ছাগলদের সাথে করছেনটা কি ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বিকারেন। 'ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি, কমরেড মার্শাল।'

'স্ট্যালিনিস্ট বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রটা আপনিই উদঘাটন করেন, হ্যাঁ,' মনে পড়লো মার্শালের। 'প্রশংসা করতে হয়।'

'টেলি-বম যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, কমরেড মার্শাল।'

'আপনার উচিত ছিলো আর্মিতে থেকে যাওয়া,' মন্তব্য করলেন মার্শাল ওনায়েভ।

'মা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই,' বললেন বিকারেন। 'কিন্তু রোগ-শোকের চেয়ে অনেক বড় শত্রু মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদকে, তাই আমি সৈনিক হই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ হতে দেরি হচ্ছে দেখে এসপিওনাজে ঢুকে পড়ি··· ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্শাল ওনায়েভ। হঠাৎ করে হাত ঝাপটা দিয়ে ওঁদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। 'শুনুন, আমরা আসলে আমেরিকার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাইছি। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা না গেলে পৃথিবীর বুকে শান্তি বা ন্যায় বিচার আসবে না, এ-কথা এখন আর পার্টির কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে আমরা ব্যবসা করবো, সাংস্কৃতিক দল বিনিময় করবো, মহাশূন্যে যৌথ উদ্যোগে অভিযানে বেরুবো, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি করবো, আবার একই সাথে তাদেরকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা কষবো, এ হয় না। ওরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি আছে, আমরা যদি

ওদেরকে শান্তিতে থাকতে দেই। কিন্তু আপনাদের টেলি-বম সব ভণ্ডুল করে দিতে যাচ্ছে। যেভাবে হোক, থামান ওটা।'

'আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, কমরেড মার্শাল,' আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'কিন্তু আপনাদের সাধ্য কতোটুকু সবারই তা জানা। আরো দু'-একটা ঘটনা ঘটলেই আমেরিকানরা জানতে পারবে কে এ-সব করাচ্ছে। তারপর কি হবে ভারতে পারেন? ওরা যদি পাল্টা আঘাত হানে, ওদের দোষ দিতে পারবেন? এবং সেই পাল্টা আঘাতটা কি ধরনের হবে আন্দাজ করতে পারেন?'

বসকে বাঁচাবার জন্যে মার্শালের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন কর্নেল বিকারেন, 'কমরেড মার্শাল, আমরা আশা করছি...।'

এমনভাবে চিৎকার করে উঠলেন মার্শাল, যেন গায়ে কোথাও আগুন ধরে গেছে। 'আপনারা জাতির কলংক! আপনারা অযোগ্য! টেবিলে ঘুসি মেরে প্রিমিয়ার বলেছেন, যে-ই এর জন্যে দায়ী হোক, তার তিনি বারোটা বাজাবেন। কান খুলে শুনুন—প্রিমিয়ার আমাকে অর্ডার দিতে বলেছেন, এই মুহূর্তে টেলি-বম থামাতে হবে। তার কেটে দিন। জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলুন। ক'জন মরবে তাতে কিছু এসে যায় না।'

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

'আপনি ওকে ব্যাখ্যা করে বলুন, বিকারেন,' গর্জে উঠলেন মার্শাল।

'রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ এবং প্রিমিয়ারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে আর কোনো উপায় না থাকলে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে টেলি-

বম এজেন্টদের নাম খরচের খাতায় লিখে রাখা যেতে পারে।'

'আপনি সিরিয়াস নন,' প্রতিবাদের সুরে বললেন কায়কোভস্কি।

'সিরিয়াস।'

'একশোর বেশি দুর্লভ এজেন্ট, আমাদের নাগরিক, যুদ্ধের সময় অমূল্য উপকারে আসবে—আপনি তাদের মেরে ফেলতে বলছেন?'

'কায়কোভস্কি, আপনি হয়তো আপোষহীন দেশপ্রেমিক, আপনি হয়তো নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট,' বললেন মার্শাল ওয়ানেভ। 'কিন্তু আপনি সমরবিশারদ নন। বললেন, যুদ্ধের সময়। কোথায় যুদ্ধ? এ-বছর, আগামী বছর, সম্ভবত এ যুগে আমেরিকার সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধছে না। আমরা সবাই যদি সুমতির পরিচয় দেই, আগামী পঞ্চাশ বছরেও যুদ্ধ বাধার কোনো কথা নয়।'

জেনারেল কায়কোভস্কির দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, জানালা দিয়ে তাকিয়ে অনেক দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্রেমলিনের গম্বুজ আকৃতির ছাদ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না।

'জেনারেল কায়কোভস্কি, সে-সময় টেলি-বম আইডিয়াটার গুরুত্ব ছিলো,' স্বীকার করলেন মার্শাল। 'কিন্তু পরিস্থিতি বদলাবার সাথে সাথে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আপনি আপনার ডীপ-কাভার এজেন্টদের ফিরিয়ে আনতে পারেন কি?'

জেনারেল ইতস্তত করতে লাগলেন, কর্নেলের পেশী শক্ত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়,' কায়কোভস্কি মিথ্যে কথা বললেন।

'দ্রুত?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন মার্শাল।

'যদি প্রয়োজন হয়,' আবার মিথ্যে বললেন জেনারেল। অপা-

রেশনটাকে বেঈমান বা আমেরিকান অনুপ্রবেশকারীদের কবল থেকে বাঁচাবার স্বার্থে টেলি-বম প্ল্যানে কোনো বোতাম রাখা হয়নি, যেটা টিপে এজেন্টদের নিউট্রাল করা যাবে। একটাই কোড সিগন্যাল শেখানো হয়েছে তাদের, টেলিফোনের মাধ্যমে সেটা পেলে ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু করে দেবে তারা। দ্বিতীয় কোনো কোড সিগন্যাল তারা শেখেনি।

'ওদের ফিরিয়ে আনুন। যতোটা সম্ভব সাবধানে, কেউ যাতে কিছু টের না পায়,' বললেন মার্শাল। 'এটা আমার অফিশিয়াল অর্ডার।'

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল।

'আমি আশা করবো, যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ওদেরকে আপনারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তা না হলে···তা না হলে কি হবে সেটা আর বললাম না। আপনিও জানেন, আমিও জানি। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না।'

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ ওঁরা কোনো কথা বললেন না। জেনারেলের অফিস কামরাটা হপ্তায় দু'বার আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে চেক করা হয়।

'ওঁকে আপনার মিথ্যে বলা উচিত হয়নি, জেনারেল কমরেড।'

'জানি,' তিক্ত হেসে বললেন কায়কোভস্কি। ডেস্ক লাইটার তুলে চুরুট ধরালেন একটা। 'কিন্তু আমি নির্ভর করছি রানার ওপর। ও যদি ডালচিমস্কিকে ধরতে পারে, তাহলে আর···।'

'মার্শাল ওয়ানেভ জানতে পারলে আপনার অসুবিধে হবে··।'

'হয়তো। কিন্তু ওপর মহলে আমারও লোকজন আছে। দরকার

হলে বড় ভাইকে দিয়ে প্রিমিয়ারকে ধরবো…।' কর্নেল বিকারেন জানেন, জেনারেলের বড় ভাই-ও একজন মার্শাল। 'কিন্তু যাই বলো, এ-ধরনের একটা কথা বলা উচিত হয়নি মার্শালের। ওরা আমাদের নিজেদের এজেন্ট। ওদের আমরা মেরে ফেলবো?'

'চাইলেও কি তা সম্ভব!'

'ওদের পক্ষে সম্ভব,' বিড়বিড় করে বললেন জেনারেল।

'মানে?'

'তুমি বুঝতে পারোনি? মার্শালকে উসকে দিয়েছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স—গ্রু। ইচ্ছে করলে ওরা আমেরিকায় লোক পাঠাতে পারে। আমেরিকায়, আমেরিকার আশপাশে ওদের কমাণ্ডো ইউনিট আছে—ছদ্মবেশে। এজেন্টদের তালিকা দিয়ে আততায়ীদের পাঠালে কি করার থাকবে আমাদের?'

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুললেন কর্নেল, 'কিন্তু মার্শালের কথাও ঠিক। প্রতি মুহূর্তে এজেন্টগুলো দানব হয়ে উঠছে। বড় বেশি ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, জেনারেল। লোকসান যদি হয়-ই, তা সেটা যতো বড়ই হোক, আমাদের মেনে নিতে হবে।'

'তুমিও তাহলে ওদের দলে!' হতাশ ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল।

'প্লিজ, জেনারেল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছি।'

'আমরা ইচ্ছে করলে তু'এক হপ্তা সময় নিতে পারি…,' শুরু করলেন জেনারেল।

তাঁকে বাধা দিয়ে কর্নেল জানতে চাইলেন, 'কিন্তু ডালচিমস্কি যদি সময় না দেয়?'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অটল মূর্তির মতো বসে

থাকলেন ওঁরা। অবশেষে প্রথমে নড়লেন জেনারেল, দেরাজ খুলে ভদকার একটা বোতল বের করলেন তিনি। তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল। এই প্রথম অফিসে ভদকা খেতে দেখছেন তিনি জেনারেলকে।

'এসো,' তিক্ত হাসির সাথে বললেন কায়কোভস্কি। 'মাসুদ রানার নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কামনা করি আমরা। এখন সে-ই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

পাশের কামরায় অপেক্ষা করছিলেন জেনারেল ইগর কুদরভ। জেনারেল কায়কোভস্কি এবং কর্নেল বিকারেন বিদায় নেয়ার পরপরই তাঁকে নিজের অফিসে ডেকে নিলেন মার্শাল ওনায়েভ।

খুব সংক্ষিপ্ত এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হলো ওঁদের মধ্যে। আলোচ্য বিষয় হিসেবে টেলি-বম যতোটা না গুরুত্ব পেলো তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেলো মাসুদ রানা।

রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল রানা, সেই ঘটনায় রুশ সেনাবাহিনী এবং মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের যে-সব অফিসাররা অপমান বোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল কুদরভ। এতোদিন প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, আজ হঠাৎ ভাগ্যগুণে সুযোগ এবং ক্ষমতা দুটোই তাঁর হাতে এসে গেছে।

কিন্তু তিনি কৌশলী মানুষ, হঠাৎ করে মুখ খুললেন না। প্রথমে তিনি মার্শালের বক্তব্য শুনলেন।

মার্শাল থামতে জেনারেল কুদরভ বললেন, 'ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মার্শাল কমরেড। টেলি-বম

এজেন্টদের ফিরিয়ে আনার কোনো পথ রাখা হয়নি, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। আর, ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে যাকে ওঁরা পাঠিয়েছেন—মাসুদ রানা—সে তো রাশিয়ার এক নম্বর শত্রু।'

সাদা ভুরু কুঁচকে মার্শাল ওনায়েভ জিজ্ঞেস করলেন, 'তার-মানে?'

'এ তো সেই লোক, যে আমাদের মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়েছিল,' বললেন জেনারেল। 'রাশিয়ার মুখে চুনকালি দিয়েছিল, মনে নেই আপনার? ছুনিয়ার সবার চোখে আমরা ছোটো হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া···।'

'তাছাড়া?'

সবজান্তার হাসি হাসলেন জেনারেল কুদরভ। 'আমার কাছে ভয়ংকর একটা খবর আছে, মার্শাল ওনায়েভ। শুনলে যে-কেউ আঁতকে উঠবে।'

মার্শাল কর্কশ সুরে বললেন, 'নাটকের অংশটুকু বাদ দেয়া যায় না?'

'বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, মার্শাল, মাসুদ রানা আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে।'

ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল ওনায়েভ। 'জানেন তো, তথ্যে যদি ভুল থাকে···।'

'জানি, মার্শাল কমরেড,' মৃত্তু হেসে বললেন জেনারেল। 'এবং জানি কার সামনে বসে কথা বলছি আমি। আমার খবরের উৎস খোদ সি. আই. এ.। ওখানে আমার এজেন্ট আছে। সে নিঃসন্দেহ হয়ে তারপর জানিয়েছে আমাকে—আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে রানা। আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি।'

'প্রমাণ, জেনারেল কুদরভ? মাসুদ রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?'

পকেট থেকে একটা টেলেক্স পেপার বের করলেন জেনারেল কুদরভ। 'এরচেয়ে ভালো প্রমাণ এই মুহূর্তে আপনাকে আমি দিতে পারবো না। এটা এসেছে মন্ট্রিঅল থেকে, আমাদের রেসিডেন্ট এজেন্টের কাছ থেকে। সি. আই. এ. থেকে আমার এজেন্ট রেডিও মারফত যা জানিয়েছে, রেসিডেন্ট হুবহু তাই টেলেক্স করে পাঠিয়েছে আমাকে।' পেপারটা মার্শালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

পড়লেন মার্শাল। 'মাসুদ রানার সাথে আমেরিকানদের যোগাযোগ হয়েছে। আর কিছু জানতে পারিনি। চ্যাপেল।'

'কে এই চ্যাপেল? মন্ট্রিঅল এজেন্ট?'

'না। সি. আই. এ.-তে আমার লোক।'

টেলেক্স মেসেজটা আবার পড়লেন মার্শাল ওনায়েভ। তাঁর কপালের পাশের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফালো। তারপর তিনি মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, পরিস্থিতি গুরুতর।'

'রানা টেলি বমগুলোর নাম-ঠিকানা জানে বলেই আমার বিশ্বাস,' বললেন জেনারেল কুদরভ। 'অর্থাৎ ডালচিমস্কি একা নয়, বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে রানাও।'

দু'জনেই একমত হলেন, রানার অপরাধ: নিষিদ্ধ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে রানা রাশিয়ার জন্যে মস্ত একটা হুমকি। দু'জন এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, ওঁরা যেন মাসুদ রানার বিচার করতে বসেছেন। বি. সি. আই. এজেন্ট আর ডালচিমস্কিকে একই চোখে দেখলেন ওঁরা। এরপর আর রায় নিয়ে কেউই দ্বিধায় ভুগলেন না।

মৃত্যুদণ্ড।

কিভাবে কার্যকরী করা হবে তাও বিস্তারিত আলোচনা হলো। তিনটে দল পাঠানো হবে। প্রথম দল দণ্ড কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় দল চেষ্টা করবে, দ্বিতীয় দল ব্যর্থ হলে তৃতীয় দল।

একই সাথে একশো ছত্রিশ জনের বিচারও হয়ে গেল। রায় সেই একই।

মৃত্যুদণ্ড।

আততায়ীদের চারটে দল পাঠানো হবে।

আরেকটা দল যাবে ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে।

ঠিক হলো, রানাকে মারার জন্যে মস্কো থেকে লোক পাঠানো হবে। ফলে আমেরিকায় পৌঁছুতে কিছুটা সময় নেবে তারা।

তবে একশো ছত্রিশ জনের দণ্ড কার্যকরী করার জন্যে আততায়ী গ্রুপগুলো মেক্সিকো থেকে ঢুকবে আমেরিকায়। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে তারা।

মনে মনে আনন্দে ডিগবাজি খেলেন জেনারেল কুদরভ। মার্শাল ওনায়েভকে দিয়ে মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন তিনি। প্রতিশোধের স্বপ্নটা তাঁর পূরণ হতে যাচ্ছে।

সাত

আটলান্টিকের দিকে মুখ করে থাকা লং আইল্যাণ্ডে একাধিক হ্যাম্পটন রয়েছে। ব্রিজ হ্যাম্পটন, সাউথ হ্যাম্পটন, ওয়েস্ট হ্যাম্পটন, আর ইস্ট হ্যাম্পটন। লং আইল্যাণ্ডের সবখানে ধনকুবেরদের বসবাস, তবে তাদের মধ্যে যারা গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ তারাই ঠাঁই পেয়েছে ইস্ট হ্যাম্পটনে। রাস্তায় লেটেস্ট মডেলের রোলস-রয়েস, ক্যাডিলাক আর মার্সিডিজ ছাড়া গাড়ি খুব কমই দেখা যায়। উঠতি বড়লোক, যারা জাঁকজমক আর বিলাসিতায় গা ভাসাতে চায়, তাদের জন্যে ইস্ট হ্যাম্পটন মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ বিশেষ। বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিক, নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট, টিভি প্রযোজক, গার্মেন্টস কোম্পানীর ডিরেক্টর, সংবাদপত্রের মালিক, বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক—বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক এবং লম্পট, ইস্ট হ্যাম্পটনে এক টুকরো জমি বা ছোট্ট একটা বাড়ি কেনার জন্যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি।

গ্রীষ্মকালে ইস্ট হ্যাম্পটন সমুদ্রসৈকতে সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহীদের মেলা বসে যায়। তাজা পুঁই ডগার মতো লকলকে যুব-

তীরা প্রতিযোগিতায় নামে, কে কার চেয়ে কতো কম কাপড় রাখতে পারে গায়ে। এবারের গ্রীষ্মে, তেসরা জুলাইয়ের এই শনিবারে, দুঃসাহসিনীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে—সমুদ্র স্নানে মত্ত হাজার হাজার পুঁই ডগার মধ্যে অনেককেই দেখা যাচ্ছে টপলেস। ভিড়ের মধ্যে খুঁজলে দু'চারটে বটমলেসও বোধহয় পাওয়া যাবে। ধন্য বলতে হয় ইস্ট হ্যাম্পটনের সজনে ডাঁটা সদৃশ তরুণদের, যৌবনের এই উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখে তারা মুগ্ধ হলো, কিন্তু উদভ্রান্ত বা উন্মাদ হলো না। কোথাও কোনো হাঙ্গামা বা হট্টগোল নেই, কেউ শিস দিলো না বা অশ্লীল কোনো মন্তব্য ছুঁড়লো না। ইস্ট হ্যাম্পটনে শুধু যে বিত্ত আর বৈভবের সমাবেশ ঘটেছে তাই নয়, এখানে রুচি আর সৌন্দর্যবোধেরও চর্চা হয়।

নীল আকাশে ঝলমল করছে সোনার চাকতি সূর্যটা। মিষ্টি রোদ আর টানা বাতাস দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তোলে। বালুকাবেলায় কোথাও এক টুকরো ময়লা পড়ে নেই। সৈকতে কেউ কোনো কাজ নিয়ে আসেনি, অথচ সবাই খুব ব্যস্ত। একটা মেয়ে হয়তো ছাতার নিচে মাথা দিয়ে সারা দেহে রোদ পোহাচ্ছে, যুবকরা তার শরীরের কোন্ অংশটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকছে সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত সে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে আরেক সুন্দরী, সে গুণছে ঘাড় ফিরিয়ে ক'জন লোক তার দিকে তাকালো। অনেকেই দল বেঁধে সাগরে নেমেছে, পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়তে ব্যস্ত তারা। অনেক ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় ডুব দিচ্ছে পানিতে—বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য ডুবে ডুবে পানি খাওয়া। বড় বড় ঢেউ আর তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে কেউ কেউ সাঁতরে অনেক দূর চলে গেছে, ছোটো ছোটো বোট পাঠিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে তাদের।

পুরুষরা অনেকেই বাঘ বা সিংহের মুখোশ পরে ঘুর ঘুর করছে মেয়েদের আশপাশে—ধরে নেয়া যায়, এদের কারো বয়সই পঁয়তাল্লিশের কম নয়।

পাঁচটা বাজতে সামান্য ক'মিনিট বাকি থাকতে স্কুবা গিয়ার পরা একটা শরীর পানির ওপর মাথাচাড়া দিলো সৈকত থেকে ষাট গজ দুরে। কেউ তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলো না, কারণ কমপ্রেসড-এয়ার ট্যাংক সহ ওয়েট স্যুট পরা লোক ইস্ট হ্যাম্পটন সৈকতে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। স্কুবা ডাইভার নিজের চারদিকে তাকালো, টুপ করে ডুব দিলো, তারপর তীর থেকে বিশ গজ দুরে আবার মাথা তুললো পানি থেকে।

'রবিন! ওহ্ রবিন! ন'হ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! কোথায় ছিলে তুমি?' মেয়েটার বয়স হবে বাইশ কি তেইশ, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, পাকা আপেলের মতো গায়ের রঙ। শরীরটা গোলগাল, কিন্তু মেদহীন। পরনে মিনি-বিকিনি, দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে পুরুষকে প্ররোচিত করার একটা ভাব। আনন্দে উদ্ভাসিত সুন্দর অবয়ব থেকে প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মায়াভরা চোখে শীতল বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। বালির শেষ প্রান্তে, পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, রাবার স্যুট পরা লোকটার দিকে কৃত্রিম রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে তাকিয়ে আছে। 'ফর গডস সেক, রবিন, উঠে এসো পানি থেকে! কই, এলে!'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পানি থেকে উঠে এলো স্কুবা ডাইভার, পা থেকে রাবার ফিন আর মুখ থেকে ফেসমাস্ক খুলে ফেললো। সুদর্শন যুবক সে, সুঠাম স্বাস্থ্য, ঠোঁটের কোণে ভুবন ভোলানো হাসি।

'রবিন, রুথম্যানরা রেগে বোম্ হয়ে যাবে,' অভিযোগের সুরে

বললো মেয়েটা। 'পরপর তিন দিন দেরি করলাম আমরা, আজ ওরা নির্ঘাৎ আমাদের বিষ খাওয়াবে।'

'মার্টিনিতে আর্সেনিক? উঁহু, ওটা রুথম্যানদের স্টাইল নয়।' সাগর থেকে উঠে আসা যুবক মাথা নাড়লো। 'এরপর তুমি হয়তো বলবে মিসেস রুথম্যান ক্লেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে।' মেয়েটার কব্জি চেপে ধরলো সে। 'চলো।'

'উফ, বরফ! ছাড়ো!' ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পা চালালো মেয়েটা। তিন গজ এগিয়ে থামলো। ঝুঁকলো সে, স্ট্র-পার্সটা তুলে নিলো বালি থেকে।

সাগর থেকে উঠে আসা মাসুদ রানা আন্দাজ করলো, ওই পার্সেই শর্ট-রেঞ্জ ট্র্যান্সমিটারটা আছে, গাইড করে তীর থেকে দেড় মাইলের মধ্যে নিয়ে এসেছিল সাবমেরিনকে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না ও। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো ঘটছে, যেমন প্ল্যান করেছিলেন কর্নেল বিকারেন। সৈকত থেকে রাস্তায় উঠে এলো ওরা, একধারে সাদা মার্বেল পাথরে কালো রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—ইজিপ্ট'স লেন। খানিকটা হেঁটে মেরুন কালারের একটা মাস্টাং কনভার্টিবল-এর সামনে থামলো মেয়েটা।

'প্রভু, আবার বলো না যে নিজের বাহনটাকেও চিনতে পারছো না,' বিদ্রূপ করলো সে।

'এমন কি সেবাদাসীর নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছি আমি।'

'হুইলের পিছনে উঠে বসলো মেয়েটা। বাঁ হাত তুলে তিন প্যাঁচ দেয়া সোনার আংটিটা দেখালো রানাকে। 'প্রাণাধিক, আমি তোমার দুঃখিনী সহধর্মিনী লিলি—লিলিয়ান—আমাকে চিনতে পারছো না, নাথ?'

মাস্টাঙে উঠে মেয়েটার পাশে বসলো রানা। 'লিলিয়ান? সহধর্মিনী? ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এতোক্ষণে মনে পড়েছে, প্রিয়ে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। 'স্বর্গে বেশ আরামেই ছিলাম। হঠাৎ কি কুমতি হলো, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হয়ে গেলাম। এই মর্ত্যে কারো কোনো উপকারে আসবো কিনা জানি না, তবে তোমার মতো সুন্দরী ভার্যা পাশে থাকলে সময়টা বোধহয় একেবারে মন্দ কাটবে না।'

খিলখিল করে হেসে উঠলো মধুকণ্ঠী লিলিয়ান। 'শুনে ধন্য হলাম। কিন্তু পুরুষমানুষ তো, আদি এবং অকৃত্রিম রোমিও– মধুলোভী চঞ্চল ভ্রমর—আমার কি সাধ্য যে তোমাকে বাঁধতে পারি। তবে আমি আছি, সর্ব অঙ্গে যৌবন আর জ্বালা নিয়ে আমি আছি।'

পুরনো, বিশাল একটা ভবনকে পাশ কাটালো গাড়ি—মেইডস্টোন ক্লাব। রাস্তার ছ'পাশে সার সার কাঁচমোড়া বাড়ি, প্রতিটি বাড়ির সামনে চোখ জুড়ানো বাগান। ইস্ট হ্যাম্পটনের ক্ষুদে শপিং এরিয়া পেরিয়ে এসে গাড়ির গতি কমলো একটু, বাঁক নিয়ে ঢুকলো রুট টোয়েনটি-সেভেনে। রুট টোয়েনটি-সেভেনেই, নিউ ইয়র্কের দিকে আরো দশ মাইল এগিয়ে, একটা হোটেলে রুম ভাড়া নিয়েছে লিলিয়ান। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্যে চমৎকার পরিবেশ। চেয়ারে আর বিছানায় ফোম-রাবার, ড্রেসিং-টেবিল আর শোকেসে ফরমিকা। এয়ার কণ্ডিশনিঙের বদৌলতে ঘরের তাপমাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা।

'বউ পেলাম, বিছানা জুটলো, এবার কিছু আহার পেলে…।'

'শরাব?' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকালো লিলি। 'স্কচ হুইস্কি?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের ওপর রাখা লম্ব. একটা

বোতলের দিকে তাকালো সে।

'ভদকা হলে ভালোই হতো, লিলিয়ান,' ওয়েট স্যুট খুলতে শুরু করে বললো রানা।

'লিলি।' কাগজের তৈরি একটা কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে রানার হাতে দিলো লিলিয়ান। 'অতীতের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে, ডিয়ার হাসব্যাণ্ড। ভদকার তুমি শুধু নামই শুনেছো, জীবনে কখনো জিভে ঠেকাওনি।'

'আপাদমস্তক আমেরিকান ?'

'অবশ্যই। শুধু কি আমেরিকান ? আমার স্বামী কখনো কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না—ট্রাফিক আইন মেনে চলে, নিয়মিত ট্যাক্স দেয়, বউকে নিয়ে উইক এণ্ডে থিয়েটারে যায়...,' হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল লিলি, রানার খালি গা দেখে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকলো।

'মানে ? কি হলো ?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো রানা।

'বোধহয় আমার নজর লেগে গেল,' জোর করে হাসলো লিলি। 'মেড ইন তাসখেন্দ ? মাশাল্লা, শরীর বটে একখানা ! দেখেই কেমন যেন ধড়ফড় করে উঠলো বুকের ভেতরটা।'

'সোনা বউরা কক্ষনো বেয়াড়া প্রশ্ন করে না।' ধড়ফড় রানার বুকটাও করে উঠলো, কিন্তু চেহারায় তার কোনো প্রতিফলন ঘটলো না। দুই চুমুকে কাপটা খালি করে টেবিলে রাখলো। 'ঠাণ্ডায় হি হি করছি, কিছু কাপড় পেলে গরম হতে পারতাম...।'

এক হাতে কাপ, অপর হাত দিয়ে ক্লজিটের হাতল ধরে টান দিলো লিলিয়ান। নীল আর বাদামি রঙের দুটো স্যুট রয়েছে ভেতরে, পাশে হলুদ ব্লেজার, আর তিনটে শার্ট। ক্লজিটের মেঝেতে

ভাঁজ করা কালো লোফার-এর ওপর এক সেট আণ্ডারওয়্যার, আর এক সেট মোজা।

'রেডিওতে ওরা তোমার সাইজ জানিয়ে দিয়েছে,' ব্যাখ্যা করলো লিলি। 'আশা করি আমার পছন্দ খুব একটা কনজারভেটিভ নয়।'

'তা নয়। হাতে টাকা এলে শহর থেকে আরো কিছু কাপড় কিনে নেয়া যাবে।'

স্ট্র-ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে দামী একটা ওয়ালেট বের করলো লিলিয়ান। 'পাঁচ হাজার ডলার আছে—একশো ডলারে আড়াই হাজার।'

ওয়ালেট খুলে টাকার বাণ্ডিলটা বের করলো রানা। গুণলো।

'নিজের বউকেও তুমি বিশ্বাস করো না?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না, নিজেকে শক্ত করে বুকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো পাউচটা ধরে টান দিলো রানা। উফ্ করে উঠলো ব্যথায়। প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে সমস্ত ডকুমেণ্ট বের করে এক এক করে ওয়ালেটে ভরলো ও। 'ড্রাইভার'স লাইসেন্স, আমেরিকান এক্সপ্রেস, আর ব্যাংকআমেরিকার্ড। পাসপোর্ট। ব্লু ক্রস, আর ব্লু শীল্ড। এ. এ. এ.। এয়ারট্রাভেল কার্ডস। আর এটা হলো—রেড ক্রস ব্লাড ডোনার'স কার্ড।'

সবজান্তার হাসি হেসে লিলিয়ান বললো, 'আমি তো বলেইছি, আমার স্বামী আদর্শ পুরুষ। কোনো কাজে খুঁত রাখতে জানে না।'

কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে চুমুক দিলো রানা। চিন্তিত। 'অস্ত্র, লিলি। আমার একটা অস্ত্র দরকার। আমারটা সাবমেরিনে রয়ে গেছে। ওয়েট স্যুটের ভেতরে করে আনলে বেঢপরকম ফুলে থাকতো…।'

তালায় চাবি ঢুকিয়ে দেরাজ খুললো লিলি। ভেতর থেকে চকলেট রঙের এয়ারব্যাগ বেরুলো। এক সেকেণ্ড পর রানার দিকে ছোট্ট একটা পয়েন্ট টুটু রিভলভার বাড়িয়ে দিলো সে, সাথে ফিট করা সাইলেন্সার।

'সত্যি তুমি লক্ষ্মী বউ ।'

রানাকে বাধা দিয়ে হাত তুলে বাথরুমটা দেখালো লিলিয়ান। 'যাও, আগে গা থেকে লবণ ধুয়ে এসো।'

মাথা নাড়লো রানা। 'লেডিস ফাস্ট।'

বাথরুমের দরজা বন্ধ হতে সিগারেট ধরালো রানা। পানির শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর প্রথমে সার্চ করলো লিলিয়ানের ব্যাগ, সবশেষে ঘরটা। রুটিন, অবহেলা করা চলে না। রানা যখন ক্ষুদে মাইক্রোফোন, আড়িপাতা যন্ত্র বা লুকানো ক্যামেরা খুঁজছে, রুশ সাবমেরিন তখন একটা কোড মেসেজ ট্রান্সমিট করছে মস্কোর উদ্দেশে, 'রোমিও সময়মতো পৌঁচেছে।' মেসেজটা একেবারেই সংক্ষিপ্ত, কি বা কোত্থেকে পাঠানো হলো নিখুঁতভাবে জানার কোনো উপায় নেই, তবে অন্তত দু'জন লোক জানার চেষ্টা করলো। তারা ইউ. এস. নেভি পেট্রল প্লেনের টেকনিশিয়ান। এধরনের প্লেনগুলোয় হাজার পাউণ্ড ওজনের ইলেকট্রনিক্স গিয়ার থাকে, থাকে অগুণতি 'ব্ল্যাক বক্স,' যেগুলোর নাম পর্যন্ত ক্লাসিফায়েড। ট্র্যান্সমিটারটা কোথায় তা তারা বুঝতে না পারলেও, টেকনিশিয়ানদের ধারণা হলো, নরফোকের আটলান্টিক ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ব্যাপারটা শুনলে খুশি হতে পারে। বিদেশী একটা সাবমেরিন, লং আইল্যাণ্ডের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসেছিল, খুব একটা হালকা ব্যাপার কি ?

জায়গা মতো পৌঁছে গেল খবরটা।

ভিজে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো লিলিয়ান। পরনে শুধু হালকা নীল প্যান্টি, বুক আর তলপেটের কাছে দু'হাতে ধরা শুকনো কাপড়চোপড়। নির্লিপ্ত চেহারা, একপাশে সরে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো। 'অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না, এই মুহূর্তে দেখার কিছু নেই···।'

'টিপিকাল আমেরিকান ট্যুরিস্ট আমি, দেখার কিছু নেই বললে শুনবো কেন?' গলা লম্বা করে বললো রানা।

'শো শুরু হবে মাঝরাতের পর,' আশ্বাস দিলো লিলিয়ান। 'টিকেট যোগাড় করতে পারলে·· কথা অসমাপ্ত রেখে কাঁধ ঝাঁকালো সে।

'আরে, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম, আমেরিকায় সব কিছু পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।'

'হ্যাঁ, এটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়। ওখানে তো বিয়ের প্রথম দিনই নব-দম্পতিকে সরকারী উপহার হিসেবে সাজানো-গোছানো একটা অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে দেয়া হয়, সারাটা জীবনের জন্যে ওখানে তারা সুখের নীড় বাঁধতে পারে। সামান্য কিছু ভাড়া দিতে হয়, ভাড়াটা পনেরো বছর আগে বেঁধে দেয়া হয়েছে, তারপর আর বাড়েনি।'

'আক্ষরিক অর্থেই সর্বহারাদের স্বর্গ,' মন্তব্য করলো রানা।

'আমেরিকাও স্বর্গ, তবে বুর্জোয়াদের।

'এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তুমি কোথাকার কি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের সব কথা জানতে চায় না,' ঠাণ্ডা গলায় বললো লিলিয়ান। 'শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকো, আমি আমেরিকান কমিউনিস্ট।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলো, 'কে. জি. বি. ছয় নম্বর রুল-টা যেন কি?'

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনফিলট্রেশন এরিয়া ছেড়ে চলে যাও।'

'জানো, তবু তুমি দেরি করছো?'

বাথরুমে ঢুকলো রানা, গোসল সেরে বেরিয়ে কাপড় পরছে এই ফাঁকে বিল মেটাবার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লিলিয়ান। মোটেল ক্লার্ককে রানার চেহারা দেখতে দেয়ার কোনো মানে হয় না, না দেখলে পরে কাউকে চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে না।

পাঁচটা চল্লিশ। রাস্তায় যানবাহন কম। মাস্টাং নিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে যাচ্ছে ওরা।

'এ-ধরনের গাড়ি আগেও তুমি চালিয়েছো,' অনুমান করলো লিলিয়ান।

'বাহান্ন ধরনের গাড়ি চালিয়েছি, ট্রেনিঙের অংশ,' বললো রানা।

'আর আটত্রিশ ধরনের বোট, হেলিকপ্টার।'

'হালকা প্লেনগুলোকে ধরলে উনত্রিশ···।'

'তোমার আসল দক্ষতা হ্যাণ্ডগান আর স্মল আর্মসে।'

'সবচেয়ে বিরক্তিকর টেলিভিশন শো-গুলো···।'

'প্রতি ছ'মাসে ছাব্বিশ ঘণ্টা ভিডিও ক্যাসেট দেখতে হয়,' সহাস্যে বললো লিলিয়ান। 'আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান, আর ফ্রেঞ্চ জনপ্রিয় সিরিজগুলো একটাও বাদ যায় না। ওই চার দেশের সমস্ত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ তোমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। মেডিক্যাল শো-গুলো কেমন লাগে?' রানা সম্পর্কে কিছু না জান-

লেও এ-সব তথ্য লিলিয়ানের পক্ষে দেয়া সম্ভব, কারণ সব কে. জি. বি. এজেন্টকেই প্রায় একই ধরনের ট্রেনিং নিতে হয়।

'উফ, নিদারুণ একঘেয়ে… !' মাথা নাড়তে নাড়তে বাঁক নিলো রানা, রাস্তার পাশে রোড-সাইন দেখা গেল—রিভারহেড অ্যাণ্ড নিউ ইয়র্ক।

'তুমি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট, রবিন। সমাজতন্ত্রের জন্যে অনেক ত্যাগ আছে তোমার।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল রানার। 'সত্যি যদি দেশের জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম, জীবন ধন্য হতো। বাদ দাও, বুঝলে। আমি কাজের কথা ভাবতে চাই।'

'ভাবো, কে তোমাকে নিষেধ করেছে ?'

'কিন্তু কি ভাববো ?' অসহায় দেখালো রানাকে। 'কি জানি আমি ?'

চুপ করে থাকলো লিলিয়ান।

'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে তুমি কিছু জানো ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমি তোমার বাধ্য স্ত্রী, এরই মধ্যে ভুলে গেছো ? আমার কিছু জানার নেই, রবিন।'

মাথা ঝাঁকালো রানা, তিন ইঞ্চি মাথা ঘুরিয়ে দেখলো লিলিয়ান হাসছে। 'মজা পাচ্ছো, নাকি বিদ্রূপ করছো ? শোনো, সব কথা জানার সত্যিই দরকার নেই তোমার। গোটা ব্যাপারটা ভয়ংকর, মিশনটাও ভয়ংকর। নিরেট গর্দভ ছাড়া এ-ধরনের মিশন নিয়ে কেউ আসে না।'

'আমি জানি তুমি ঠিকই বলছো, হানি।'

কিন্তু রানা হাসলো না। 'আর শোনো, আমার ভেতর যথেষ্ট উৎসাহ নেই, গোপনে এ-ধরনের কোনো অভিযোগ করতে যেয়ো না। আমার সাথে যতোক্ষণ থাকছো, কোথাও কারো সাথে যোগাযোগ রাখা চলবে না। কাজটা যে প্রায় অসম্ভব, মস্কোয় সে-কথা আমি বলে এসেছি। ওদের কোনো বিকল্প ছিলো না বলে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।'

কথা না বলে পায়ের ওপর পা তুলে দিলো লিলিয়ান, ফলে মিনি-স্কার্ট হাঁটুর ওপর আরো খানিক উঠে এলো। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো রানা, এ-ধরনের ব্যাপার কখনোই ওর চোখ এড়ায় না।

'আমার সাথে তোমাকে ওরা ভিড়িয়ে দিলো, কারণটা কি জানো?' লাল একটা ফেরারি-কে ওভারটেক করলো রানা।

'সম্ভবত আমি খুব হাসতে পারি, তাই,' মিটিমিটি হেসে বললো লিলিয়ান। 'আমার আরো অনেক গুণ আছে। পুরুষদের মন ভোলাতে পারি। নাচতে পারি, নাচাতে পারি। আনআর্মড কমবাটে ট্রেনিং নেয়া আছে, ভালো পিস্তল চালাতে জানি। জুডো শিখেছি, কারাতে শিখেছি। তোমার যা যা প্রয়োজন সব আমি মেটাতে পারবো।'

'সস্তা হয়ে যাচ্ছো না?'

'নির্ভর করে ব্যাপারটাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার ওপর। আমি একজন আমেরিকান কমিউনিস্ট, সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী। যদি দেখি তোমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছো, সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বাধা দেবো। তার আগে পর্যন্ত আমি তোমার অনুগত···।'

'বুঝেছি। শোনো, এই মিশন সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে

বলা যেতে পারে। আমার কাজ একজন লোককে খুঁজে বের করা। আমাদের লোক। সশস্ত্র, এবং সম্ভবত উন্মাদ।'

রাস্তার ধারের ফলকে লেখা রয়েছে লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেসওয়ে আর চার মাইল সামনে।

'উন্মাদ?'

'বিপজ্জনক, ম্যানিয়াক, বেঈমান। কমিউনিজমের পরম শত্রু। বিশ্বশান্তির জন্যে বিরাট একটা হুমকি। অসন্তুষ্ট একটা দানব।'

'কোথায় সে?' চোখ পিট পিট করলো লিলিয়ান। 'ওয়াশিংটনের কাছাকাছি কোনো সি. আই. এ. সেফ হাউসে?'

'না, সে একাই খেলছে। কোথায়?' রাস্তার ওপর চোখ রেখে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'কেউ জানে না। টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, শিকাগো, লস এঞ্জেলস, মিশিগান, যে-কোনো রাজ্যে হতে পারে। কিংবা হয়তো আমেরিকাতেই নেই, মন্ট্রিঅলের কোনো হোটেলে বসে তা দিচ্ছে গোঁফে।'

অসম্ভব নয়। কানাডার সাথে আমেরিকার ডাইরেক্ট ডায়াল সিস্টেম রয়েছে, উত্তর সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার বুদের যে-কোনো একটা থেকে টেলিফোন করতে পারে ডালচিমস্কি। পানির মতো সহজ একটা কাজ ষাট কি সত্তর ডলার খুচরো পয়সা পকেটে থাকলে অনায়াসে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে লোকটা। অবশ্য যদি সন্ধ্যার পর ফোন করে, দিনে বেশি পয়সা লাগবে।

'তোমাকে কি ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তোমাকে সাহায্য করতে হবে। কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। কে. জি. বি. রেসিডেন্ট তোমাকে বলতে বলেছেন, গোটা কে. জি.

বি. অ্যাপারাটাস···।'

'ভুলে যাও : ওদের সাহায্য নেয়া সম্ভব নয়।'

লিলিয়ানের জোড়া ভুরু ধনুকের আকৃতি নিলো। 'তুমি কি বলতে চাও এখানে আমাদের কে. জি. বি. নেটওয়র্কে আমেরিকান কাউন্টার এসপিওনাজ অনুপ্রবেশ করেছে?'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায়? রেসিডেন্ট ক'জন লোককে নিয়ে কাজ করছে? পাঁচ শো? এক হাজার? যেখানে এতোগুলো লোক জড়িত, সেখানে তোমাকে ধরে নিতে হবে দু'একজন নিশ্চয়ই পেনি-ট্রেট করেছে।' দুষ্ট হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে মীন করছি না, প্রিয় বন্ধু।'

'তোমাকে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন নোংরা কথা বলো, ডিয়ার রবিন। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিলো এমন একজন কেউ আমার জীবনে আসবে···।'

'কিন্তু আমরা স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না। আসল কথা হলো, তামার লোকদের সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না।'

'তুমি চাও, কথাটা আমি রেসিডেন্টকে জানাই?'

'গোটা ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছো তুমি। একটু আগে ললাম, কারো সাথে যোগাযোগ করা চলবে না। এটা এক নম্বর নির্দেশ। দু'নম্বর নির্দেশ, যখন যা করতে বলবো তখুনি তাই করবে, কোনো প্রশ্ন করবে না।'

'যথা আজ্ঞা, হুজুর।'

'যদি বুঝি আমার কথা শুনছো না, সাথে সাথে বাদ দেয়া হবে তোমাকে।'

'এবং তোমার কথা আমাকে ভুলে যেতে হবে···।'

'সে দায়িত্ব পালন করবে মাথায় একটা বুলেট।'

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো লিলিয়ান। 'এতো কঠিন তুমি হতে পারো, রবিন? বিশেষ করে মেয়েদের সাথে?'

'চকলেট আর ফুল আসবে পরে,' কথা দিলো রানা। 'তার আগে নিজেকে বিশ্বস্ত আর অনুগত বলে প্রমাণ করো। মেয়েদের ব্যাপারে আমি শুধু নরম নই, উদারও। সেজন্যেই তো আমাদের নেতা আমাকে মহিলা সদস্যা বাড়াবার দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'নেতা?'

'তুমি জানো না আমি একজন রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান?' হাত বাড়িয়ে গাড়ির রেডিওটা অন করলো রানা। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা গেয়ে উঠলো, ইউ মেক মি ফীল সো ইয়াং। রানার গায়ে হেলান দিলো লিলিয়ান। ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসলো রানা।

রানা হাসছে, কিন্তু মস্কোয় কর্নেল বিকারেন সেই যে ভুলে গেছেন তারপর থেকে আর হাসতে পারছেন না। নিজের অফিসে গোমড়া মুখে বসে আছেন তিনি, ডালচিমস্কি যদি সফল হয় তাহলে মার্কিন মিসাইলের প্রথম ঝাঁকটা এই মস্কোতেই প্রথম আঘাত হানবে। কর্নেলের সামনে তিনটে মেসেজ রয়েছে, তিনটেই এই মাত্র দিয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট কুরাডিন। প্রথম মেসেজে বলা হয়েছে, ইস্ট হ্যাম্পটনের তীরে নিরাপদে পৌঁচেছে "রোমিও"। দ্বিতীয় মেসেজ একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে—লাক ডু ফ্ল্যামবিউতে, টোরান ন্যাভাল কমিউনিকেশন সেন্টারে টেলি-বম আক্রমণ। তৃতীয় মেসেজটা শুধু দুঃসংবাদ নয়, ভয়ংকর দুঃসংবাদ। মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে কে. জি. বি.-র নিজস্ব চর আছে, তার কাছ থেকে এসেছে

খবরটা। গ্রু-র চারটে কমাণ্ডো গ্রুপ মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। শুধু তারিখ নয়, কোন্ রাজ্যের কোন্ এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে তারা তাও জানানো হয়েছে। কমাণ্ডো গ্রুপগুলোর উদ্দেশ্য—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে টেলি-বমগুলোকে অকেজো করে দেয়া।

তারমানে একশো ছত্রিশ জন রুশ এজেন্টকে খুন করতে চাইছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স।

কর্নেল বিকারেনের মাথায় আগুন ধরে গেল। সেই সাথে অসহায় বোধ করলেন, কি করবেন বুঝতে পারছেন না। পনেরো মিনিট কাটলো উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে। গ্রু-র সাথে আলোচনা করে লাভ নেই। রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভের পরামর্শ এবং নির্দেশ পেয়েই কাজ করছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স। মার্শাল ওনায়েভ নিজস্ব নীতিতে চলেন, কে. জি. বি.-র কথা তিনি কানে তুলবেন না। এ-ব্যাপারে সম্ভবত প্রিমিয়ারের অনুমতিও নেয়া আছে তাঁর।

কিন্তু তাই বলে কে. জি. বি. তার একশো ছত্রিশ জন দুর্লভ এজেন্টকে এভাবে হারাতে পারে না। এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। মাসুদ রানাকে সময় দেয়া দরকার, সুষ্ঠু একটা সমাধান তার দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারে। ডালাচিমস্কি ধরা পড়লে এই একশো ছত্রিশ জন আর হুমকি থাকে না। অন্তত রানা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

লাল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন কর্নেল বিকারেন। জেনারেল লুদভিক কায়কোভস্কির সাথে জরুরী বৈঠক করা দরকার! গ্রু-র গ্রুপগুলো সম্পর্কে রানাকে জানাতে হবে। দরকার হলে

গ্রুপগুলোর অস্তিত্ব এফ. বি. আই.-কে জানিয়ে দিতে পারে রানা। প্রতিটি গ্রুপে পাঁচজন করে থাকলে মোট বিশজন, একশো ছত্রিশ জনকে রক্ষার বদলে বিশজনকে যদি হারাতে হয়, তাতে ক্ষতি কি?

আট

'সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে থাকি আমি,' কুইনস-মিডটাউন টানেল থেকে ব্যস্ত ম্যানহাটনে বেরিয়ে এলো মাস্টাং, রানার কনুই ধরে একটু চাপ দিয়ে বললো লিলিয়ান।

'করো না, করতে।' থার্ড এভিনিউ-এ ঢুকবে রানা, ট্রাফিক আলো বদলাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে তুমি থাকতে চাও না?'

'সম্ভব হলে তোমার শহরেই থাকতে চাই না।'

'কারণ?' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'কি ভুল-ভাল করে রেখেছো আমি জানি? জোর করে বলতে পারো, গত তিন মাস ধরে মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের কোনো শাখা তোমার ওপর নজর রাখছে না?'

'ভুলে যেয়ো না আমি একজন প্রফেশনাল...।'

'প্রফেশনালরা ভুল করে না?'

ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকলো লিলিয়ান।

'এমনও হতে পারে,' শান্তভাবে আবার বললো রানা, 'হয়তো কে. জি. বি. রেসিডেণ্ট-ই তোমার ওপর নজর রাখছে। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলিয়ান। 'সান্ত্বনা এইটুকু যে স্বামী আমার অত্যন্ত সাবধানী লোক।'

কিছু বলতে গিয়েও বললো না রানা, একটা স্টেশন ওয়াগেনকে এড়াবার জন্যে গাড়ির স্পীড কমালো।

'সুখের নীড় তাহলে কোথায় আমরা…।'

'ইস্ট ফিফটি-সিক্সথ্-এ, হোটেল স্যাভয়।'

'গ্যাস স্টেশন থেকে তাহলে ওখানেই ফোন করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। দশ মিনিট পর হোটেল স্যাভয়ের আটশো আঠারো নম্বর কামরায় পৌঁছে গেল ওরা। সময় নষ্ট না করে স্যুটকেস খুলে কাপড় বের করলো রানা, ক্লজিটের ভেতর ওয়ার্ড-রোবে সাজিয়ে রাখলো। লিলিয়ান কি ভাবছে বুঝতে পেরে বললো, 'ডিনারের পর তোমার জামা-কাপড় আনার ব্যবস্থা করা যাবে। রোজ গার্ডেনের স্টেক খুব ভালো, চলো আগে ওখানে যাই।'

রেস্তোরাঁটা সেকেণ্ড এভিনিউয়ে। চলতি হপ্তায় যার নাম লিলি-য়ান সে তার নিজের জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলো। স্পাই শিরোমণি মাসুদ রানা হতাশায় ভুগছে, কারণ মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না কোত্থেকে বা কিভাবে শুরু করবে কাজটা, তাই সিদ্ধান্ত নিলো অ্যালকোহল স্পর্শ করবে না। তবে সঙ্গিনীকে যুক্তি দেখালো, 'ভদকার অভাব আর কিছুতে কি মেটে!'

রানা লক্ষ্য করলো, রাত যতো বাড়ছে ততোই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে লিলিয়ান। চেহারায়, দৃষ্টিতে, কথায়—আশ্চর্য একটা আনন্দ, আশ্চর্য একটা উত্তেজনা। মানেটা কি? এ সবের মানেটা কি?

আদিম প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। নরম চোখে বারবার লিলিয়ানের দিকে তাকাচ্ছে রানা। একবার ভাবলো, আমি যে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, ও কি তা টের পাচ্ছে?

যেহেতু স্বামী-স্ত্রী, একটাই ভাড়া নেয়া হয়েছে ঘর। নিজেকে তিরস্কার করলো রানা। শালা!

আর লিলিয়ান ভাবছে, ওর আর কি দোষ, সব দোষ পরিবেশের! যখন রাশিয়ায় ছিলো, এ-ধরনের কুচিন্তা ওকে স্পর্শই করতে পারেনি। কিন্তু এখন যে আমেরিকায় রয়েছে, সেক্স ফ্রি সোসাইটি, কাজেই লোভ-লালসার পাখা তো গজাবেই। আহা বেচারী, বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা এসেছে, পাশে একটা মেয়ে থাকলে রিয়্যাকশন তো হবেই। তবে হাবভাবে যতোই আদি রসের বাড়াবাড়ি থাকুক, হয়তো শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে। আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে ওর পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল লিলিয়ানের। ভাবলো, আমি ওকে কোনো সুযোগ দিতে চাই না, কিন্তু ও যদি সুযোগ নিতে চেষ্টা না করে, আমি বুঝবো আমার নারীত্বকে অপমান করা হলো। মনে মনে স্বীকার করলো সে, মেয়েরা বড় জটিল।

'তুমি বিবাহিত?' ভরপেট খেয়েদেয়ে রাত এগারোটায় রেস্তোরাঁ থেকে বেরুলো ওরা, গাড়িতে চড়ার সময় মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা। চারদিকটা ভালো করে দেখে

নিতে ব্যস্ত।

জোর করে হাসলো লিলিয়ান। 'কি নাম তার? কেমন দেখতে সে?' শরীরের ভেতর রক্তস্রোত মন্থর হয়ে পড়লো। শিরশিরে অনুভূতিটা আর নেই।

জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো রানা। 'এখনো আশি ডিগ্রীর কম নয়,' জুলাইয়ের তাপমাত্রা আন্দাজ করলো ও।

'হিউমিডিটি আরো বেশি হবে। উত্তর দেবে না?'

গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা। 'তুমি জানো।'

'আরে না! তোমার সম্পর্কে তেমন কিছুই আমাকে জানানো হয়নি...,' পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, পুলকের আতিশয্যে অবশ হয়ে গেল লিলিয়ানের সারা শরীর। 'ঠাট্টা করো না তো?'

'না।'

'কাউকে ভালোবাসো?'

'না।'

'কেউ তোমাকে ?'

'একজন বাসতো, সে বেঁচে নেই!' মুহূর্তের জন্যে রেবেকার কথা মনে পড়লো রানার। 'আরেকজন ভালোবাসে, কিন্তু সে অন্য রকম ভালোবাসা।' মনটা কেমন যেন হয়ে গেল রানার—বেঁচে আছে, কিন্তু ওর জীবন থেকে যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে সোহানা।

রানার বিষণ্ণ চেহারা দেখে এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ালো না লিলিয়ান। ওর গাড়ি চালানো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো, 'আমেরিকায় আগেও তুমি এসেছো।'

'বেশ ক'বার।'

উত্তর দিকে আরো খানিক এগিয়ে বাঁক নিয়ে থার্ড এভিনিউয়ে

ঢুকলো রানা, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে সিক্সটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে চলে এলো।

রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার সময় লিলিয়ান বলেছিল দুশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে থাকে সে, রিভারসাইড ড্রাইভের মুখ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, তিন তালার একটা অ্যাপার্টমেন্টে। সেন্ট্রাল পার্ক ধরে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'দুশো চুরাশি, তাই না ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

'প্রথমে বাড়িটার সামনে দিয়ে দু'তিনবার আসা-যাওয়া করবো, কেমন ?'

'সত্যি তুমি ধরে নিচ্ছো আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো রানা।

কাঁধ ঝাঁকালো লিলিয়ান। 'আমি তোমার সাথে তর্ক করতে যাচ্ছি না।'

'হানিমুনে বেরিয়ে কোন্ মেয়েই বা তা করে ?'

আপ সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট থেকে সেভেনটি থার্ডে চলে এলো মাস্টাং, তারপর রিভারসাইড ড্রাইভের পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এসে সেভেনটি-সিক্সে ঢুকলো। পর পর আরো দু'বার চক্কর দিলো রানা। তারপর ওয়েস্ট এণ্ড এভিনিউ আর সেভেনটি ফিফথ্-এর মোড়ে নামিয়ে দিলো লিলিয়ানকে। 'ঠিক পনেরো মিনিট সময় নেবে তুমি,' বললো ও। 'একটা কি দুটো স্যুটকেস, তার বেশি নয়। এগারোটা পঁচিশে বাড়িটার বাইরে থাকবো আমি। ঠিক আছে ?'

মাথা ঝাঁকালো লিলিয়ান। যার যার হাত ঘড়ি চেক করলো

ওরা। সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে লিলিয়ান, গাড়িটা ব্রডওয়ে-তে তুলে নিয়ে এসে পার্ক করলো রানা। পরচুলা পরা একজোড়ো কলগার্ল ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল, ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাদেরকে হতাশ করলো ও। আমেরিকার সবগুলো বড় শহরের যে-কোনো রাস্তায় এদেরকে দেখা যাবে, খদ্দেরের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। দেহ দানই এদের পেশা। রাশিয়ায় যা কল্পনাও করা যায় না।

মেয়ে দুটো মোড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, উল্টোদিকের পথ ধরলো রানা। দুশো চুরাশি নম্বর বাড়িটা দূর থেকেই দেখা গেল, রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে কোনো ডেলিভারি ভ্যান বা টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক আছে কিনা দেখে নিলো ও। কারো ওপর নজর রাখার জন্যে সাধারণত এ-ধরনের বাহনই ব্যবহার করা হয়। নেই —কিন্তু তার মানে এই নয় যে সত্যি কেউ নজর রাখছে না। রানা লক্ষ্য করলো, আশপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় একটা করে খিলান, খিলানের ভেতরটা অন্ধকার। ওই অন্ধকারে, বা কোনো বাড়ির ছাদেও কেউ থাকতে পারে। কে জানে, হয়তো দুশো চুরাশি নম্বরের কোনো জানালা দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ রাখছে কেউ। জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেললো রানা।

একটা কিশোরকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো ও। নিগ্রো, হাভাতে। ম্রিয়মান চেহারা, গায়ে নোংরা কাপড়। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ডাস্টবিনের সামনে থামলো। উঁকি দিয়ে দেখছে তুলে নেয়ার মতো কিছু আছে কিনা ভেতরে। দুনিয়ার অন্যতম ধনী দেশ এমনকি আমেরিকাও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, কিশোরের আগমন শুভ-লক্ষণ নয়। ডাস্টবিনের ভেতর ঝুঁকে রয়েছে, সিধে হবার নাম নেই। সন্দেহটা আরো বাড়লো রানার। ছোকরা কাউকে সিগন্যাল দিচ্ছে না তো?

অন্ধকার একটা খিলান থেকে রাস্তার আলোয় বেরিয়ে এলো দু'জন। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। মেয়েটার বয়স হবে আঠারো কি ঊনিশ, ছেলেটার বিশ কি বাইশ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। সম্ভবত দু'জনেই মাতাল, স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারছে না। এতো দীর্ঘ চুমো খেলে ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরুবে না?

হেসে ফেললো রানা।

আর ঠিক তখনই ডাস্টবিনের ভেতর থেকে মাথা তুলে সিধে হলো নিগ্রো কিশোর। ঘাড়ে ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেলো রানা। পিছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ এলো, 'সাবধান! নড়ো না!'

'বেশ,' ফিসফিস করে বললো রানা। 'কি চাও?' বেশ বুঝতে পারছে, ঘাড়ে ওটা ঠেকে আছে ছোরার চওড়া ফলা।

'ঘড়ি আর ওয়ালেট,' পিছন থেকে বললো ছিনতাইকারী। মদের গন্ধ পেলো রানা। 'আগে ওয়ালেটটা। আস্তে করে বের করো পকেট থেকে, পিছন দিকে ফেলো।'

'তুমি ভুল করছো,' শান্তভাবে বললো রানা। লক্ষ্য করলো, নিগ্রো ছেলেটা ঘন ঘন রাস্তার দু'পাশে তাকাচ্ছে। পুলিশের গাড়ি আসতে দেখলে সঙ্গীকে সাবধান করে দেবে সে।

'চোপ শালা! যা বলছি কর্!'

সদ্য রাশিয়া থেকে এসেছে বলেই সম্ভবত, সমাজতান্ত্রিক আর

পুঁজিবাদী দুনিয়ার পার্থক্যটা বড় বেশি চোখে বাধছে রানার। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সারা বছরে গোটা রাশিয়ায় দশ কি বারোটার বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি, প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিনতাই-কারী ধরা পড়েছে এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেয়েছে। আর আমেরিকায়? যে-কোনো বড় শহরের প্রতিটি রাস্তায় প্রতিদিন কয়েক ডজন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে, সর্বস্ব খোয়াচ্ছে নিরীহ পথচারী, বাধা দিতে গেলে আহত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে, প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী ধরা পড়ে না। আর তৃতীয় বিশ্বের কথা চিন্তা না করাই ভালো। সেখানে অনেক দেশেই ছিনতাই হচ্ছে পুলিশের সাইড বিজনেস।

তিন সেকেণ্ডের মধ্যে এ-সব চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়, ইতিমধ্যে পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে ফেলেছে ও।

'পিছন ফিরবে না, ওটা ফেলে দিয়ে দু'পা সামনে বাড়াও!'

ওয়ালেট ফেলে দিলো রানা, রুদ্ধশ্বাসে বললো, 'পুলিশ!' বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরলো, দেখলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার ওপারে নিগ্রো কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। রানার চালাকিটা বুঝতে পারার আগেই আধমণ ওজনের একটা ঘুসি খেলো চ্যাপ্টা নাকে। অপর হাতটা দিয়ে তার বুকে ধাক্কা দিয়েছে রানা, ছিটকে গেল দেয়ালের দিকে, শক্ত ইটের সাথে ঠুকে গেল মাথা। ছোরাটা নর্দমায় পড়ে ডুবে গেল। নিজের জায়গা ছেড়ে রানা নড়লো না, শুধু ঝুঁকে তুলে নিলো ওয়ালেটটা। 'ভাগো,' শান্ত গলায় বললো ও। 'বললাম না, ভুল করছো!'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে সিধে হলো লোকটা। চল্লিশের কম নয় বয়স, হাড্ডিসার চেহারা। টলমল পা ফেলে চলে

যাচ্ছে। কেন যেন মায়া লাগলো রানার। রাস্তার ওপারে তাকালো ও। কিশোরটাকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যর্থ লোকটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা মর্মবেদনায় ছেয়ে গেল মনটা, লোকটার দিকে পিছন ফিরলো ও।

সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটের বাড়িগুলোর জানালা, দোরগোড়া, আর পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলালো রানা। রিভারসাইড ড্রাইভের মোড়ে বাঁক নিচ্ছে একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভের দিকে শান্ত ভাবে এগোলো ও। উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে সেভেনটি-সেভেনথ্ ঘুরে ব্রডওয়েতে মাস্টাঙের কাছে ফিরে এলো। ষাট বছরের এক বুড়োর সাথে দর কষাকষি করছে পরচুলা পরা সেই মেয়ে দুটো। দুটো শব্দ কানে এলো রানার—'জমজমাট পার্টি'। মাস্টাঙের দরজা খুললো ও।

ঠিক এগারোটা পঁচিশে ঘ্যাঁচ্ করে দুশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সের সামনে থামলো গাড়ি। রূপালি জরির কাজ করা কালো একটা ঢোলা পোশাক পরে বেরিয়ে এলো রহস্যময় নারী। হাইহিলের খটাখট পরিচিত আওয়াজ আর হাঁটার ভঙ্গি দেখে চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কেউ মারা গেছে?'

'মানে?' অবাক হলো লিলিয়ান।

রানা কিছু বললো না।

'কি হলো? হঠাৎ…,' পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, সেই সাথে গম্ভীর হয়ে গেল লিলিয়ান। বললো, 'তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ, রবিন। অদ্ভুতভাবে কথা বলো। বুঝতে সময় লাগে।'

'বুঝতে যদি পেরে থাকো তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো

না কেন ?'

চোখ জোড়া হেসে উঠলো লিলিয়ানের। 'কালো কাপড় পরলাম কেউ মারা গেছে বলে নয়। তবে তুমি ঠিকই ধরেছো—শোকই প্রকাশ করছি আমি, আগাম।'

'মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বলতে চাও ?'

'কাজ শেষ হলে মস্কোয় ফিরে যাবে তুমি, জীবনে আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। শোকে কাতর হবার মতো একটা ব্যাপার নয় ?'

'তা বটে,' মুখে বললো বটে রানা, কিন্তু মনে মনে ভাবলো, মেয়েটার ট্রেনিঙে খুঁত রয়ে গেছে। অতিনাটুকে হয়ে ওঠার প্রবণতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আরো একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করে। মেয়েদের মন সত্যি বড় জটিল। পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে এখনো সময় নেবে এই মেয়ে।

একটা বুকস্টলের সামনে গাড়ি থামিয়ে কয়েকটা পেপারব্যাক কিনলো রানা, ঘুম আনার জন্যে ওষুধের কাজ দিতে পারে। আরেক বার গাড়ি থামালো একটা সুপারমার্কেটের সামনে। একা নেমে গেল রানা, ফিরে এলো হাতে এক গোছা গোলাপ নিয়ে। লিলিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'আজ রাতের জন্যে আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার।'

স্যাভয়ের নরম বিছানায় ওই গোলাপ দু'জনের মাঝখানে কাঁটা হয়ে থাকলো। বিছানার ঠিক মাঝখানটায় ফুলগুলো রেখে এক ধারে শুয়ে পড়লো লিলিয়ান, রানা তখন চেয়ারে বসে বই পড়ছে। রাত একটার দিকে বই বন্ধ করলো ও। আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠলো।

ফুলগুলো সরালো না। তখনো জেগে ছিলো লিলিয়ান, কিন্তু রানাকে বুঝতে দিলো না। ফুল ফুলের জায়গায় থাকবে বুঝতে পেরে একটু পর ঘুমিয়ে পড়লো সে। ক্ষীণ একটু আশাহত হলেও, দেহ-মনে কোনো টেনশন ছিলো না। ঘুমটা হলো নিবিড়।

রানা অবশ্য আরো অনেকক্ষণ জেগে থাকলো। এর আগের কোনো অ্যাসাইনমেণ্টে এতোটা অসহায় বোধ করেনি ও। বুঝতেই পারছে না কোত্থেকে শুরু করবে কাজটা। এই পেশায় প্রথম যখন ঢোকে তখন প্রায়ই একটা ভয় অস্থির করে তুলতো ওকে, অ্যাসাইনমেণ্ট না ব্যর্থ হয়! সেই পুরনো ভয়টা আজ অনেক দিন পর ফিরে এসেছে মনে। কোথায় ডালচিমস্কি? কোথায় তাকে খুঁজবে সে? কাউকে কিছু বলা চলবে না, কারো সাহায্য নেয়া যাবে না, তাহলে কিভাবে শুরু করবে?

কারো না কারো সাহায্য নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিলো রানা। খানিকটা সুস্থির হলো মন। ঘুম এলো।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো মাথার চুলে আঙুলের আলতো স্পর্শে। ভান করে পড়ে থাকলো রানা। একটু পর নরম ঠোঁটের স্পর্শ পেলো কপালে। গোপনে আদর করে বিছানা থেকে নেমে গেল লিলিয়ান। রানার সারা শরীরে ভালোলাগার মিষ্টি একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। তবু সেই সাথে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো, হয়তো আরো ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারা যাবে না, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে আমাকে।

বাথরুম থেকে বেরুলো লিলিয়ান, এই সময় নক হলো দরজায়। ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওয়েটার। তার সামনেই রানার বুকে হাত রেখে নাড়া দিলো লিলিয়ান, 'আর কতো ঘুমাবে,

ডিয়ার !'

চোখ কচলাতে কচলাতে বিছান'র ওপর উঠে বসলো রানা। ফুলগুলো চেপ্টে গেছে, কার চাপে কে জানে।

ব্রেকফাস্টের শেষ দিকে, কফি খাবার সময়, রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে লিলিয়ান বললো, 'তুমি কাজ করছো।'

'সারাক্ষণ।'

'চৌঠা জুলাই, ন্যাশনাল হলিডে-তেও, রবিন ?' তাজা ফুলের সমস্ত কোমল ভাব ফুটে রয়েছে লিলিয়ানের চেহারায়। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করলো, জীবন সুন্দর তার কারণ জীবনে যৌবন আছে।

'সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার এটা একটা কৌশল,' উত্তরে বললো রানা।

'তারমানে কি কাজটায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে ?'

'এইটুকু—কারো সাহায্য নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছি।'

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে লিলিয়ান বললো, 'পুরস্কার ঘোষণা করছো না কেন ?'

'কাকে দেবো ? চিন্তা করো না। দু'এক দিনের মধ্যে পথ একটা ঠিকই পেয়ে যাবো। কে জানে, উল্লুকটা হয়তো ছুটি উপভোগ করছে। হয়তো সৈকতে রোদ পোহাচ্ছে, কিংবা মেয়েদের সাথে টেনিস খেলছে। কিংবা হয়তো বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে আছে ফিলাডেলফিয়ার কোনো ব্রথেলে। উন্মাদটার পক্ষে সবই সম্ভব।'

নিকোলাই ডালচিমস্কি এই মুহূর্তে রোদও পোহাচ্ছে না, টেনিসও খেলছে না। বেভারলি-উইলশায়ার হোটেলের লাক্সারি স্যুইটে

রয়েছে সে; আত্মপ্রেমে মগ্ন। ভিজে গা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা শুকনো তোয়ালে। এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে সে। আয়নায় একদৃষ্টে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্রূপের হাসি হাসলো লোকটা। ওরা কেউ তাকে এতোদিন চিনতে পারেনি। সে নিজেই কি নিজেকে চিনতে পেরেছিল? জানতো, তার শিরায় শিরায় ধ্বংসের উন্মাদনা সুপ্ত হয়ে আছে?

আয়নায় প্রতিফলিত নগ্ন শরীরটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ডালচিমস্কি। মনে মনে স্বীকার করলো, আমি একটা অতিকায় বনমানুষ। অতিকায়, কিন্তু মেদবহুল নয়। লালচে-কালো লোমে ঢাকা, লোমের গোড়াগুলোয় সোনালি একটু ভাব। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আপনমনে হাসলো, তাকে এই অবস্থায় দেখে ভয় পাবে না-ই বা কেন মেয়েরা!

তার ভেতর যে পশুত্বের পরিমাণ আর সবার চেয়ে বেশি, এটা অনেক বছর আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে ডালচিমস্কি। এমন একটা ছকে বাঁধা, বিধিবদ্ধ সমাজে বড় হয়েছে সে যেখানে যে-কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়তে হয়। ছোটোবেলা থেকেই অপরাধপ্রবণ হলেও, বয়স একটু বাড়ার সাথে সাথে অপরাধ গোপন করার কৌশল শিখে ফেলে সে। এ-ব্যাপারে তাকে পথ দেখায় তার বাবা।

তার বাবা অসম্ভব বদরাগী ছিলো। বাবার সেই রাগ নগ্নভাবে প্রকাশ পেতো। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অযথা মাকে মারধর করা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েদের গায়ে বাবা তখনো হাত তুলতো না, শুধু চোখ রাঙাতো আর দাঁত চাপতো। কিন্তু অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা যখন চলে গেল, নতুন

শিকার হিসেবে ছেলেমেয়েদের বেছে নিলো বাবা।

সেই অল্প বয়েসেই নিজের ছোটো দুই বোনকে দু'চোখে দেখতে পারতো না ডালচিমস্কি। ওদের অপরাধ ছিলো, ওরা তাকে এড়িয়ে চলতো, তার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতো। সে নাকি নোংরা, তার গায়ে নাকি উকুন, পা না ধুয়ে বিছানায় ওঠে, পকেটে রুমাল রাখে না, ইত্যাদি হাজার রকম অভিযোগ। মা চলে যাবার পর ডালচিমস্কি লক্ষ্য করলো, তার চেয়ে বোন দুটোর ওপরই বাবার বেশি রাগ। ডালচিমস্কি ন্যাড়া ছিলো, কাজেই বাবা তার কান ধরতো। কিন্তু বোন দুটোর ছিলো লম্বা চুল, সেই চুল ধরে হিড়হিড় করে ওদের টেনে আনতো বাবা। ডালচিমস্কি মার খেলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতো, কিন্তু তার চোখে কেউ কখনো পানি দেখেনি। বোন দুটো মার খেয়ে অঝোরে কাঁদতো, কিন্তু কোনো শব্দ করতো না। শব্দ না করায় আরো উৎসাহ পেতো বাবা।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এক ঢিলে দুই পাখি মারার একটা সুযোগ দেখতে পেলো ডালচিমস্কি। বাবা বাড়িতে ফিরলেই বোনদের নামে সত্যি-মিথ্যে অভিযোগ করতো সে। বাবা তাকে সাহায্যকারী হিসেবে পেয়ে খুশিই হলো। কিছু দিন পর দেখা গেল বাড়ি ফিরেই বাবা ডালচিমস্কিকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, আজ কে কি অপরাধ করেছে, কার পড়া হয়নি, কাঁচের গ্লাসটা কার হাত থেকে পড়ে ভাঙলো, নোংরা কাপড়গুলো ধোয়া হয়নি কেন, ইত্যাদি। দুই বোনের কে শাস্তি পাবে, সেটা নির্ভর করতো ডালচিমস্কির ওপর। বাবা কার ওপর নির্যাতন চালাবে সেটা ঠিক করে দিতো সে। বাবা যখন বেত দিয়ে বোনদের একজনকে বেদম পেটাতো, অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চকর আনন্দে শিহরিত হতো ডালচিমস্কি।

বোনেরা তাকে যমের মতো ভয় করতে শুরু করলো। এটা লক্ষ্য করে নতুন আরেক ধরনের উল্লাস বোধ করতো ডালচিমস্কি। সে উপলব্ধি করলো, মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালালে বিপদ হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ মুখ বুজে সহ্য করাই ওদের স্বভাব। সম-বয়েসী বন্ধুদের চোটপাট দেখাতে গিয়ে উল্টো শিক্ষা পেয়েছে সে, তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

শুধু বাড়িতে নয়, স্কুলেও একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে সফল হলো ডালচিমস্কি। নিজে সে মেয়েদের সাথে লাগতে যেতো না, তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ছেলেদেরকে খেপিয়ে তুলতো। এভাবেই তার কৈশোর কাটলো। যৌবনে আর কলেজে পা দিয়ে স্বমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ডালচিমস্কি। সে না চাইতেই মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর হবে না-ই বা কেন? হাজার লোকের ভিড়ে সবচেয়ে লম্বা দেখায় তাকে। সুদর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সব রকম খেলাধুলোয় কলেজের গর্ব। মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে শুরু করলো ডালচিমস্কি। প্রথমে নরম আচরণ করে কাছে টানে, তারপর বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার চেষ্টা চালায়। নিজের ভেতর যে পশুত্ব আছে, তার স্বরূপ এই সময় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। সেই সাথে নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে সে। প্রতিবার একটা করে মেয়েকে বেছে নেয় ডালচিমস্কি। ঘনিষ্ঠ হবার পর নিজের ঘরে নিয়ে আসে তাকে। প্রথম প্রথম মেয়েটা বুঝতে পারে না তাকে আদর করা হচ্ছে নাকি নির্যাতন করা হচ্ছে। মেয়েটা ভাবে, প্রেম আর ভাবাবেগের গভীরতা খুব বেশি, তার সাথে যোগ হয়েছে গায়ে অসুরের শক্তি—সেজন্যেই কি এই বাড়াবাড়ি? কিন্তু কিছু দিন যাবার পর তার ভুল ভাঙে। প্রথমে ডালচিমস্কি আদর

দিয়ে শুরু করলেও, দিনে দিনে আদরের মাত্রা কমতে থাকে, বাড়তে থাকে নির্যাতনের মাত্রা। এমন সব কুরুচিপূর্ণ আদর করে সে, মেয়েটা বুঝতে পারে একটা সেক্স ম্যানিয়াকের খপ্পরে পড়ে গেছে সে। লোক লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না, তবে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারে, কারো কারো বেশ দেরি হয়ে যায়। তবে ডালচিমস্কির এ-ব্যাপারে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। একজন যেতে না যেতে আরেকজন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয়। কাজেই অত্যাচার চালাবার জন্যে মেয়ের কখনো অভাব হয় না তার।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ডকুমেন্টস তৈরির ওপর একটা দু'-বছরের কোর্স কমপ্লিট করে ডালচিমস্কি। পররাষ্ট্র দফতরে তিন বছর চাকরি করে, বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণই ছিলো প্রধান দায়িত্ব। এই চাকরি করার সময়ই ডকুমেন্টস কিভাবে জাল করতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে সে। এরপর তাকে বিদেশে পাঠানো হয়, বিভিন্ন দূতাবাসে চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্টের সহকারী হিসেবে কাজ করে সে। ব্রিটেনে দু'বছর, ফ্রান্সে দেড় বছর, জার্মানীতে এক বছর, এবং আমেরিকায় এক বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে যোগ দেয় কে. জি. বি.-তে।

পলিটিক্স নিয়ে আগ্রহ বা মাথাব্যথা, কোনোটাই ছিলো না ডাল-চিমস্কির। কিন্তু স্ট্যালিনপন্থী কিছু লোক মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা কিভাবে যেন জেনে ফেলে। দলে ভেড়ার জন্যে প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে। ডালচিমস্কি সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে, এই সময় তার পদোন্নতি ঘটে। তাকে জানানো হয়, স্ট্যালিনপন্থীরা চেয়েছে বলে তার এই পদোন্নতি হয়েছে। প্রস্তাবটা

আবার দেয়া হয় তাকে, সেই সাথে বলা হয় মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা সংশ্লিষ্ট মহলের জানা আছে। আরো বলা হয়, ডালচিমস্কি রাজি হলে দলে মেয়ে সদস্য বাড়াবার দায়িত্বটা তাকেই দেয়া হবে। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজি হয়ে গেল ডালচিমস্কি।

মাথার ওপর প্রভাবশালী একটা মহলের ছত্রছায়া পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠলো পিশাচটা। দু'জন পুরুষ সহকারী ছিলো তার, তাদেরকে সরিয়ে মেয়ে সহকারী নিলো। প্রথম বছরে ছ'টা মেয়েকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করে পাঠালো সে, তাদের বদলে নতুন মেয়েরা কাজে যোগ দিলো। এক বছর পর আবার আমেরিকায় পাঠানো হলো তাকে। স্ট্যালিনপন্থী নেতারা এবার তার কাঁধে বড় একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। বিদেশে যারা কে. জি. বি. এজেন্ট আছে তাদেরকে দলে ভেড়াতে হবে, কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এমন বিদেশী লোকদের কাছেও তুলে ধরতে হবে স্ট্যালিনবাদের আদর্শ। ছ'মাস পর দেশে ফিরলো ডালচিমস্কি, তার সাফল্য দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো স্ট্যালিনপন্থী নেতারা। বিশেষ করে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি আছে এমন কিছু আমেরিকান মেয়েকে স্ট্যালিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে সে।

স্ট্যালিনপন্থীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিলো ডালচিমস্কি, পালাতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি যে দেখা দিতে পারে, সে ধারণা তার আগে থেকেই ছিলো। কাজেই পালাবার রাস্তা তৈরি ছিলো তার। আমেরিকায় থাকতে হলে প্রচুর মার্কিন ডলার দরকার হবে, তাই নির্দিষ্ট একটা ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা লুঠ করার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সাথে নিলো

সে। আর নিলো কে. জি. বি. র মূল্যবান দলিলগুলোর একটা—টেলি-বম খাতা।

তার ভেতরে যৌন-বিকৃতি আছে, এটা ডালচিমস্কি জানতো। ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে দু'জনকে খুন করার সময় জানলো তার ভেতরে একজন খুনীও বাস করে। ওদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে এমন অদ্ভুত উল্লাস বোধ করে সে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। রাজনৈতিক আদর্শের কারণে নয়, স্রেফ অকারণ প্রতিশোধ নেয়ার উন্মাদনা থেকে, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে কবচ হিসেবে কাজে লাগবে মনে করে দেশ ছেড়ে পালাবার সময় টেলি-বম বুকটা সাথে করে নেয় সে। তারপর, বিপজ্জনক এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপদ বোধ করার পর সে উপলব্ধি করলো, ঘটনাচক্রে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক হয়ে পড়েছে সে। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো ডালচিমস্কি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, উল্লাস আর পুলক তাকে উন্মাদ করে তুলছে। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একশো চল্লিশটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে পারে সে, পারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে, যেগুলোর বেশিরভাগই সামরিক স্থাপনা—এই চিন্তাটা পাগল করে তুললো তাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটার নাম ডালচিমস্কি। আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারি।

ডেনভারে প্রথম টেলিফোনটা স্রেফ কৌতুক করার জন্যে করলো ডালচিমস্কি। দেখি তো কি হয়, এই রকম একটা ভাব কাজ করেছিল তার ভেতর। টেলি-বম এলিস থেলার ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল বেসে গিয়ে তিনজন লোককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলো, তারপর ডিনামাইট ভর্তি ট্রাক নিয়ে ধাক্কা খেলো এম. নামে চিহ্নিত বিল্ডিংটার সাথে। এই ঘটনার পরপরই ডালচিমস্কি উপলব্ধি করলো, তার

ভেতরে ধ্বংস করার একটা প্রবণতা রয়েছে। ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস বিস্ফোরিত হওয়ার খবর শুনে অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করলো সে, যে পুলকের কাছে নারী-সম্ভোগের চরমানন্দও কিছু নয়।

ডালচিমস্কি জানে, তাকে খুঁজে বের করার জন্যে কে. জি. বি. লোক পাঠাবে আমেরিকায়। দুনিয়ার বুক থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না রাশিয়া। কিন্তু তার হাতে রয়েছে সকল মারণাস্ত্রের সেরা মারণাস্ত্র, টেলি-বম বুক—ছোট্ট একটা খাতা—তাকে রক্ষা করার জন্যে সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

তারপর আবার ফোন করলো ডালচিমস্কি। একটা উদ্দেশ্য ছিলো, যারা তাকে ধরতে আসবে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া। দ্বিতীয় কারণটা ছিলো, আবার সেই পুলক অনুভব করার উদগ্র বাসনা।

এভাবে একের পর এক টেলি-বম বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে ফলাফল কি দাঁড়াবে ডালচিমস্কির তা ভালো করেই জানা আছে। প্রথম প্রথম মার্কিন ইন্টেলিজেন্সগুলো কিছু বুঝতে না পারলেও আরো দু'একটা ঘটনা ঘটলেই তারা আসল ব্যাপার টের পেয়ে যাবে। রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করেছে, আমেরিকাকে তারা ধ্বংস করতে চায়, ঠিক এই উপসংহারে পৌঁছুবে। তারপরই শুরু হবে আসল খেল্। রাশিয়ার ভেতর স্যাবোটাজ চালাবার কোনো না কোনো আয়োজন নিশ্চয়ই মার্কিন সরকারও করে রেখেছে। পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করবে তারা। কিংবা তারা হয়তো রাশিয়ার এ-ধরনের হঠকারী আচরণে এমন রাগাই রাগবে, পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

সভ্যতা একদিন বিলীন হবেই, দুনিয়া অনন্তকাল টিকবে না,

মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য, সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, তাহলে মন্দ কি! কয়েক যুগ ধরে আশংকা করছে মানুষ, এই বুঝি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো, কিন্তু বাধেনি। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে কি ঘটবে কেউ তা জানে না, মানুষ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে। সে যদি যুদ্ধটা বাধিয়ে দিতে পারে, মানবজাতিকে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা করা হবে। উপরি পাওনা, নিজের জীবদ্দশায় পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞটা চাক্ষুষ করা হবে। এই সব যুক্তি খাড়া করে ডালচিমস্কি, আর মনে মনে পুলকিত হয়। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি পাগল? নাকি পশু?

নিজের ভেতর থেকে উত্তর আসে, মানুষ মাত্রই পশু কিন্তু মানুষ তা স্বীকার করে না।

আমি নিজেকে চিনেছি। নিজের পরিচয়টা অস্বীকার করি না।

আমি পশু।

একটা পশুর যে আচরণ করার কথা আমি ঠিক তাই করছি।

এ ধরনের চিন্তা ভাবনার ফলে মানবজাতির অনিষ্ট করার জন্যে নিজের কাছ থেকে একটা লাইসেন্স পেয়ে গেছে ডালচিমস্কি। তার কোনো অপরাধবোধ নেই। মানুষকে সে ভালোবাসে না।

কাল রাতে শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা মোটেলে ছিলো ডালচিমস্কি। ভালো ঘুম হয়নি, বারবার শুধু মনে হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান আর বিপজ্জনক লোকটা তৃতীয় শ্রেণীর একটা মোটেলে রাত কাটাবে কেন! সকাল হতে না হতে তাই বেভারলি-উইলশায়ারে স্যুইট ভাড়া নিয়েছে সে। এই হোটেলের গল্প আগেই শুনেছিল, ইচ্ছেও ছিলো সুযোগ পেলে এখানে একবার উঠবে। গল্পটা মিথ্যে নয়—হোটেলের লবি, লাউঞ্জ আর সুইমিং

পুলে সারাক্ষণ সুন্দরী মেয়েদের ভিড় লেগে আছে। এখন অবশ্য কাজের কথা ভাবছে সে, তা না হলে সুন্দরী দেখে একটা মেয়েকে পটিয়ে-পাটিয়ে ঘরে আনতে পারতো। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ডালচিমস্কি অনুভব করলো, উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে গা মুছে কাপড় পরে নিলো ডাল-চিমস্কি। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো, সবুর করো বাছা, মজা করার আরো অনেক সময় পাবে। এখুনি তো আর দুনিয়াটা ধ্বংস করে দিচ্ছো না তুমি!

একটা কথা ভেবে খারাপ হয়ে গেল মনটা। বেভারলি-উইল-শায়ারে মাত্র একটা দিন থাকতে পারবে সে। কিন্তু মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই, নিরাপত্তার খাতিরে নিয়ম মেনে চলতে হবে তাকে—চব্বিশ ঘণ্টার বেশি একটানা কোথাও তার থাকা চলবে না।

সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে কে. জি. বি. কর্তৃপক্ষ জেনে ফেলেছে টেলি-বম খাতাটা চুরি গেছে। কে চুরি করেছে তা-ও তারা জানে। ঘেমে গোসল হচ্ছে ব্যাটারা, আপনমনে হাসতে হাসতে ভাবলো সে। যতোই সময় পেরোবে ততোই দিশেহারা বোধ করবে তারা, ততোই অসহায় বোধ করবে। ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষের আরাম হারাম হয়ে যাবে।

হোটেলের কফিশপে নেমে এসে ভরপেট নাস্তা সারলো ডাল-চিমস্কি। তারপর সুইমিং পুলের কিনারায় একটা চেয়ারে বসলো কিছুক্ষণ। অর্ধনগ্ন নারী-দেহ আবার তাকে উত্তেজিত করতে শুরু করায় ওখান থেকে সরে এলো সে। সাড়ে দশটা বাজে। একটু হাঁটার জন্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো—

নিজেকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয় না, কিছুই যখন ভালো লাগছে না, আরেকটা টেলিফোন করা যাক।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে দশ মিনিট পর একটা বুদ দেখতে পেলো ডালচিমস্কি। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, কাঁচের দরজাটা বন্ধ করলো সযত্নে। প্রথমে পকেট থেকে এক-গাদা খুচরো পয়সা বের করে কাউন্টারের ওপর সাজালো। তারপর ছোটো একটা কালো নোটবুক বের করলো। এটাই সেই সর্বনেশে খাতা। নম্বর আর নাম দেখে নিয়ে ডায়াল করতে যাবে, এই সময় টোকা পড়লো দরজায়।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো ডালচিমস্কি।

পানপাতা আকৃতির একটা মুখ, তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। হাসিতে মুক্তো ঝরছে। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার কি দেরি হবে, মিস্টার ?'

ডালচিমস্কির মনে হলো, মেয়েটা ইচ্ছে করলে নায়িকা হতে পারে। চেহারায় কোনো খুঁত নেই, গায়ের চামড়া আর দাঁত নিষ্কলংক। ফোন নাহয় পরে করা যাবে, তারচেয়ে মেয়েটার সাথে আলাপ জমানো যায় কিনা দেখা যাক। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করলো সে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুললে চলবে কেন। নামটা সই না করে মেয়ে-টেয়ের কথা ভাববে না সে। মৃদু হেসে উত্তর দিলো, 'না, এই এক মিনিট।'

'ধন্যবাদ,' বলে একটু দূরে সরে গেল মেয়েটা।

তার দিকে পেছন ফিরে দ্রুত ডায়াল করলো ডালচিমস্কি।

সেদিন সন্ধ্যা ছ'টায় পাশে 'সহধর্মিনী'-কে নিয়ে কালার টিভিতে আইউইটনেস নিউজ দেখছিল রানা। মার্কেটিং সেরে হোটেল

স্যাভয়ের এই কামরায় খানিক আগে ফিরেছে ওরা। প্রথমে দেখানো হলো চ্যানিউট, ক্যানসাসে সেদিন বিকেলে কি ঘটেছে। ক্যানসাস টেলিফোন কোম্পানীর মেইন সুইচিং পয়েন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো। গোটা রাষ্ট্রের টেলিফোন নার্ভ সেণ্টার বলা হয় ওটাকে। একের পর এক কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটেছে ওখানে। এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব করে তোলে যে সার্কিটগুলো তার সবগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। অন্যান্য আরো কয়েক ডজন কী লাইন কোনো কাজ করছে না। রাষ্ট্রের তিনটে অন্যতম বিশাল টেলিভিশন নেটওঅর্কের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। টেলিফোন কোম্পানীর চার ধারে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তিরিশটার মতো রোডব্লক খাড়া করা হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিশ বিভাগের সদস্যদের জানানো হয়েছে, নীল মটরসাইকেল আরোহী কাউকে দেখামাত্র আটক করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, ঘটনাস্থল থেকে নীল মটরসাইকেল আরোহী একজন লোককে পালাতে দেখা গেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার সর্বশেষ রিপোর্ট এইমাত্র এসে পৌঁছুলো। থাইয়ার শহর থেকে তিন মাইল দূরে এক খামার বাড়িতে স্টেট পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে লোকটাকে।

'সবচেয়ে ভালো হয় লোকটা যদি সুইসাইড পিল খায়,' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'তা না হলে গুলি খেয়ে মরুক। ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো লিলিয়ান, তবে রাগের কারণ বুঝতে না পারলেও কোনো প্রশ্ন করলো না। তার জানা নেই অন্তর্ঘাতক ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন রুশ সেনাবাহিনীতে

আর্টিলারির একজন ক্যাপটেন ছিলো, যদিও সেটা অনেক দিন আগের কথা। এবার টিভির পর্দার কাছ থেকে খামার বাড়িটাকে দেখানো হলো, অদৃশ্য একজন বক্তা ব্যাখ্যা করলো, ঘটনাস্থল ক্যানসাস থেকে রিপোর্ট করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ক্যামেরা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন স্টেট আর লোকাল পুলিশকে দেখা গেল বৃত্তাকারে ঘিরে আছে খামার বাড়িটাকে। দ্রুত জুম করলো ক্যামেরা, সদর দরজার পাশে একটা জানালা দেখানো হলো কাছ থেকে। ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটে গেল, কেঁপে উঠলো চোখের পাতা। ঝড়ের বেগে কথা বলে চলেছে রিপোর্টার। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা, কিন্তু জানালার ভেতর কিছু দেখতে পাবার আগেই আরেক দিকে ফিরলো ক্যামেরা। ক্যামেরা ফেরার আগে রানা শুধু দেখলো জানালার পর্দা ঝাঁকি খেলো। তারপরই শোনা গেল পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ড আগে লোকটার মৃত্যু কামনা করলেও, কি ঘটছে বুঝতে পেরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল রানার চেহারা, দু'হাতে মুখ ঢাকলো ও।

'রবিন!' ফিসফিস করে ডাকলো লিলিয়ান। কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালো রানা, সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো।

'তুমি নিশ্চয়ই এই লোকটাকে খুঁজতে আসোনি, রবিন?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

মাথা নাড়লো রানা। লিলিয়ানকে বলা চলে না, বেচারা অসহায় একটা শিকার। আরো একজন। বলা চলে না, পুলিশ যদি লোক-

টাকে মেরে ফেলে, সবার জন্যেই তা ভালো হবে। জীবিত ধরা পড়লে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে লোকটাকে। তার ওপর নির্যাতন চালানো হবে, এক সময় সব কথা ফাঁস করে দেবে সে। আমেরিকানরা জানবে, রাশিয়ানরা তাদের সাথে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে।

তারপর কি ঘটবে ভাবতেও ভয় হয়।

ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন জীবিত ধরা পড়লে সবচেয়ে খুশি হবে ম্যানিয়াক ডালচিমস্কি। সে-ও হয়তো এই মুহূর্তে টিভির সামনে বসে দৃশ্যটা দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

এবার রানা ঠিকই ভেবেছে। বেভারলি-উইলশায়ারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একুশ ইঞ্চি কালার টিভির পর্দার দৃশ্যটা চাক্ষুষ করছে ডালচিমস্কি। ক্যানসাস রিপোর্ট শেষ হতে সেট অফ করে দিলো সে, কাপড় বদলে বেদিং স্যুট পড়লো। পুবদিকের ফ্লাইট ধরার আগে হাতে আধঘণ্টার মতো সময় বেশি আছে, একটু সাঁতার কাটার সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না।

সকালের মধ্যে মস্কোয় পৌঁছে যাবে খবরটা।

ঘেমে নেয়ে উঠবে সবাই। হাহ্‌-হা!

নয়

'একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না,' ফিফথ এভিনিউ, একটা বুক-স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো রানা।

'কিসের প্যাটার্ন ?'

লিলিয়ানের কথা রানা শুনতে পেলো না। জাপানী রেস্তোরাঁ থেকে বেশ কিছুক্ষণ হলো বেরিয়েছে ওরা। কখনো হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, কখনো কোনো দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, মাঝে মধ্যে টুক-টাক কেনাকাটাও চলছে। বার কয়েক মৃদু চেষ্টা করেছে লিলিয়ান, কিন্তু রানার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করতে পারেনি। রানা যেন মন দিয়ে শুধু নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলোই শুনছে।

'লোকটার মন আমি বুঝি। বেজন্মাটা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে। তার একটা প্ল্যান না থেকেই পারে না?'

খুক্ খুক্ করে কাশলো লিলিয়ান।

'তালিকা আর শিডিউল তৈরি করা তার পেশার একটা অংশ ছিলো…প্যাটার্ন একটা থাকতেই হবে।' আবার বললো রানা।

'তুমি কি ক্যানসাসের ওই লোকটার কথা… ?'

‘যদিও প্যাটার্নটা কি হতে পারে বুঝতে পারছি না,’ বললো রানা, ওর ধারণা লিলিয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ও। ‘নাস্টি কিছু একটা হবে, নাস্টি অ্যাণ্ড ট্রিকি—কিন্তু কি সেটা?’

‘হ্যাপি বার্থডে!’ আচমকা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো লিলিয়ান।

চোখ পিটপিট করলো রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো লিলিয়ানের দিকে। ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?’

‘ভাবলাম অবাক কিছু একটা বলি। দেখে তো মনে হচ্ছিলো না তুমি জানো পাশে কেউ আছে।’

‘সরি···ক্যানসাসের ওই লোক? তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করো না। এতোক্ষণে ওরা তাকে সম্ভবত মেরে ফেলেছে, কিংবা সে নিজেই হয়তো আত্মহত্যা করেছে। অথচ শুধু শুধু। বেচারার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু করার কিছু নেই। প্রশ্ন হলো, তাকেই যে বেছে নেয়া হলো···কেন? হয়তো খাতা খুলে যার নামটা প্রথম চোখে পড়ছে তাকেই ফোন করছে। হয়তো আসলে কোনো প্যাটার্নই নেই। কিংবা হয়তো প্যাটার্ন একটা থাকলেও, সেটাকে ঠিক প্যাটার্ন বলা যায় না।’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো রানা। র‍্যাকে সাজানো বই-পত্রের দিকে মনোযোগ দিলো।

‘আমি তোমাকে একটা বই উপহার দিতে চাই,’ ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান।

‘সেক্স ইন মিডনাইট?’ একটা বইয়ের নাম পড়লো রানা।

‘ওরে আমার সবজান্তা!’ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলো লিলিয়ান। বইটা শপিং ব্যাগে ভরে হাতে ঝুলিয়ে নিলো সে। দাম চুকিয়ে ওখান থেকে সরে এলো ওরা। রাস্তায় লোকজন কম, যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। জড়িয়ে ধরার মতো একজন রানার

পাশেও রয়েছে। কিন্তু উৎসাহ নেই।

'প্ল্যানটা হয়তো আমাকে বদলাতে হতে পারে,' বললো রানা, বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোলো ও, ফিফটি-সিক্সথ স্ট্রীট ধরে।

'তোমার একটা প্ল্যান আছে তাই আমার জানা ছিলো না।'

'ডলার দরকার। পঞ্চাশ হাজার।' কি যেন ভেবে কৌতুক অনুভব করলো রানা। 'পারবে যোগাড় করতে?'

অনেক টাকা, তিন সেকেণ্ড ইতস্তত করলো লিলিয়ান। তারপর বললো, 'একটাই উৎস, রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি যতোটুকু বুঝেছি, তুমি চাও না আমাদের এখানকার কারো সাথে আমি যোগাযোগ করি।'

'তা চাই না, কিন্তু টাকাটা আমার দরকার। তোমার পরিচয় আমেরিকানদের কাছে যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে, দ্বিতীয়বার কিছু ফাঁস হবার থাকছে না। পঞ্চাশ হাজার, বিশ আর পঞ্চাশ ডলারের নোট।'

ট্রাফিক সিগন্যালে যানবাহন থেমে আছে, ছুটে রাস্তা পেরোলো ওরা।

'রেসিডেন্টের সাথে কিভাবে আমার যোগাযোগ হয় শোনো,' রানাকে বললো লিলিয়ান। 'সোমবারে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পাই আমি, কোড করা মেসেজ। আমার কিছু বলার থাকলে একই জায়গায় আমার মেসেজ রেখে আসি।' রাস্তার ধারে মেয়েদের একটা টেইলারিং শপ দেখে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলো সে। 'কাল যদি ওখানে মেসেজ রেখে আসি, মঙ্গলবারে হয়তো আমি টাকাটা সংগ্রহ করতে পারবো।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'এ-ধরনের

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপজ্জনক। কিন্তু তবু আমাদের ঝুঁকিটা নিতে হবে। ওখানে মেসেজ রেখে আসার পর, টাকাটা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে তুমি। অন্য কোনো হোটেলে উঠবে। টাকা পাবার পর স্যাভয়ে ফোন করে মিঃ ম্যাট ইসটনের নামে একটা মেসেজ রেখে দেবে। তুমি ফোন করার দু'ঘণ্টা পর ঠিক এই জায়গা থেকে দক্ষিণ দিকে ফিফথ্ এভিনিউয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সোজা ক্যাথেড্রাল পর্যন্ত যাবে তুমি···কি যেন নাম ওটার?'

'সেণ্ট প্যাট্রিক?'

'হ্যাঁ। ক্যাথেড্রালে ঢুকে দশ মিনিট প্রার্থনা করবে। ওখানে যদি আমাকে না দেখো, পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরে থারটি রকফেলার প্লাজা পর্যন্ত যাবে, আইস স্কেটিং রিং পেরিয়ে। এন. বি. সি. বিল্ডিঙের আশপাশে সারাক্ষণ প্রচুর লোকজন থাকে, ওটাই তোমার দ্বিতীয় চেক-পয়েন্ট। লক্ষ্য রাখবে কেউ তোমার পিছু নিয়েছে কিনা। যদি নেয়, ওই ভিড়ের মধ্যে তাকে তুমি খসাতে পারবে।'

'ওখানে আমি আমার হারানো স্বামীকে খুঁজে পাবো?'

'না। ফরটি-এইটথ্ বা ফরটি-নাইনথ্, দুটোর কোথাও মেট্রোপোল বার দেখতে পাবে—টপলেসের জন্যে বিখ্যাত। ওরা আবার পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভেও অংশগ্রহণ করে। ওখানে।'

'আমি চাই না আমার স্বামী কেন, পাম কোর্টে থাকলেই তো পারো!'

'টপলেস পর্যন্ত সইতে পারবো, কিন্তু বটমলেস··· হাত জোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করলো রানা।

'এ মা, ছি, ওখানেও···জানতাম না তো!'

'বিশ্বাস না হয় তো চলো এখুনি একবার ঢু মেরে আসি,' প্রস্তাব করলো রানা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল লিলিয়ান। 'না। আমি ঘরে যাবো।'

'ওহ্-হো,' হেসে উঠে বললো রানা, 'ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি একটা বই কিনেছো।'

রানার হাতের উল্টো পিঠে একটা রাম চিমটি কাটলো লিলিয়ান। 'ওটা তোমাকে উপহার দেয়া হয়েছে, হাঁদারাম।'

জোরে পা চালালো লিলিয়ান, তার পাশে থাকার জন্যে রানাও হাঁটার গতি দ্রুত করলো। 'সোমবারে কোথায় তুমি মেসেজ পৌঁছে দেবে?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা।'

'আহা, আমাকে জানালে দোষের কিছু নেই···।'

'ভুলে যেয়ো না, তুমি অস্থায়ী। আমাদের লোকাল অপারেশন সম্পর্কে সব কথা তোমার জানার দরকার নেই।'

'নাকি ভাবছো আসল স্কুবা ডাইভার না-ও হতে পারি আমি?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো রানা।

চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো লিলিয়ান। হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়লো, ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে একবার দেখেও নিলো রানাকে। তারপর মাথা নাড়লো।

'কেন, সাগরে কোথাও লোক-বদল ঘটতে পারে না?' চ্যালেঞ্জ করলো রানা। 'কে. জি. বি. এজেন্টের সলিল সমাধি ঘটেছে? আমি আমেরিকান?'

'সম্ভব, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।'

পার্ক এভিনিউয়ে এসে পার্কিং লটে থামলো ওরা। হাঁটবে বলে মাস্টাঙটা এখানে রেখে গিয়েছিল। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো লিলিয়ান, এক সেকেণ্ড পর তাকে অনুসরণ করলো রানা।

মনে মনে রানার প্রশংসা করলো লিলিয়ান। পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই লক্ষ্য করছে সে, সারাক্ষণ নিজের চারপাশে নজর রাখছে ও, কিন্তু হাবভাবে সেটা প্রকাশ পায় না। পাশে রয়েছে অথচ অনেক সময় ওর অনেক আচরণের অর্থ বোধগম্য হয় না, পরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তাৎপর্যটুকু ধরা পড়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এই লোক কে. জি. বি.-র একটা সম্পদ।

রানা ভাবছে অন্য কথা। হঠাৎ করেই, প্রায় বিদ্যুৎ চমকের মতো, নিজের একটা ত্রুটি লক্ষ্য করেছে ও। কাজটা কিভাবে শুরু করবে এখনো ঠিক করতে পারেনি, এ তার এক ধরনের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মেনে না নিয়ে উপায় নেই, মেনে নিয়েছেও। ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, জানে ও। সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক আছে, তবে অস্বস্তিবোধ করছে না, করার দরকারও নেই। ত্রুটিটা হলো, স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট বা রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের তরফ থেকে কোনো বিপদের আশংকা করছে না ও।

অথচ করা উচিত।

মনে পড়লো, কর্নেল বিকারেন ওকে বলেছেন, টেলি-বমের একটা খাতা রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের কাছে আছে, সেটা পাহারা দেয় গ্রু-র প্রহরীরা। তারমানে ডালচিমস্কি আমেরিকায় যা করছে তার তাৎপর্য মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ঠিকই বুঝতে পারবে। হয়তো এরই মধ্যে বুঝেও ফেলেছে তারা। হয়তো কে. জি. বি.-র কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে বসেছে। এখন জানে, ডালচিমস্কিকে ধরার

জন্যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে পাঠানো হয়েছে আমেরিকায়।

রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে এমন অনেক লোক আছে যারা দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে, জানে রানা। তাদের প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়।

নিজের নিরাপত্তার জন্যে কৌশল বদল করতে হবে ওকে। এতোক্ষণ শুধু পিছন দিকে নজর রাখছিল, এখন থেকে সামনেও নজর রাখতে হবে।

ভাগ্যিস কিছু একটা ঘটার আগেই ত্রুটিটা দেখতে পেয়েছে সে!

স্ট্যালিনপন্থী বা স্ট্যালিনপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কে. জি. বি. এজেন্ট এবং রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, এরাই তার আসল শত্রু হয়ে দেখা দিতে পারে। সি. আই. এ. বা মার্কিন কোনো ইন্টেলিজেন্সকে আপাততঃ ভয় না পেলেও চলবে।

তারপর ভাবলো, এ-ধরনের একটা চিন্তা হঠাৎ করে আমার মাথায় এলোই বা কেন? সামনে কোনো বিপদ নেই তো?

খুক্ করে কাশলো লিলিয়ান, তারপর বললো, 'পুতুলটা কিন্তু যান্ত্রিক নয়।'

বাস্তবে ফিরে এলো রানা। ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে। 'সে আমি বইটা উপহার পেয়েই বুঝেছি।'

দু'জনের কেউই জানে না, শেষ পর্যন্ত কি গতি হবে বইটার।

গাড়ি রেখে হোটেলের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। 'আজ যে ফুল কিনলে না?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'কারণটা অবভিয়াস নয়? দু'জনের মাঝখানে আজ কোনো কাঁটা চাই না।'

হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো লিলি-য়ান।

রাত বেশি হয়নি, তবু স্যাভয়ের রিসেপশনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগলো। রিসেপশনে ঢোকার সময় একটু পিছিয়ে পড়লো রানা, কারণ জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছে লিলিয়ান।

সোফায় সুন্দরী একটা মেয়ে বসে আছে, উল্টোদিকের সোফায় বসা তিনজন মধ্য বয়স্ক লোক নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে। আরেক ধারে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে আছে ওভার-কোট পরা এক প্রৌঢ়, খবরের কাগজ পড়ছে। এই সময় খবরের কাগজ পড়ছে, একটু অস্বাভাবিক নয়? রিসেপশন কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটোখাটো এক লোক।

এলিভেটরের সামনে পৌঁছে গেছে লিলিয়ান। ঢোকার সময় উপস্থিত সবাই ওদের দিকে একবার করে তাকিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ তাকিয়ে নেই।

কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে এগোলো রানা। এলিভেটরের সামনে, বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলিয়ান ওর দিকে পিছন ফিরে। এগারো তালায় রয়েছে এলিভেটর, নামছে নিচের দিকে।

হঠাৎ রানার ইচ্ছে হলো দাঁড়িয়ে পড়ে। জিনিসটা কি জানে না, কিন্তু বেমানান কিছু একটা লক্ষ্য করেছে ও। রিসেপশনে ঢোকার সাথে সাথে। কি?

প্রৌঢ় লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে?

না। অন্য কিছু।

এলিভেটরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ও। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। কি?

ঘামতে শুরু করলো রানা।

পিছনে পরিচিত পায়ের আওয়াজ থেমে যেতে ঘাড় ফেরালো লিলিয়ান। দেখলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রানা, ফিরে যাচ্ছে রিসেপশনের দরজার দিকে।

কি? একই প্রশ্ন রানার মনে। ঠিক করেছে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে, নতুন করে আসার সময় হয়তো চিনতে পারবে জিনিসটা।

কাউন্টার ঘেঁষে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো রানা, খুশি হয়ে উঠলো মন। কাউন্টারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটোখাটো, সুবেশী লোকটা। হাতে ক্ষুদে একটা রেডিও। ছোট্ট এবং সস্তা। স্যাভয়ের অভিজাত পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। রেডিওটা কানের কাছে ধরে একমনে যন্ত্রসঙ্গীত শুনছে লোকটা।

সকৌতুকে রানার দিকে তাকালো সে। কিন্তু সিধে হলো না। সবিনয়ে হাসলো রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে বো করলো। 'সুন্দর তো!' বলে অপ্রত্যাশিতভাবে হাত বাড়িয়ে রেডিওটা প্রায় ছিনিয়ে নিলো, কিন্তু হাসিটুকু ম্লান হলো না।

'এ কি অভদ্রতা!' ঝট্ করে সিধে হয়ে প্রতিবাদ জানালো লোকটা।

এলিভেটরের কাছ থেকে রানাকে লক্ষ্য করছে লিলিয়ান। সে একা নয়, সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

লোকটার কথা রানা যেন শুনতে পায়নি। চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রেডিওটা। 'মেড ইন জাপান। জাপানীরা ছাড়া এতো সুন্দর জিনিস আর কারাই বা তৈরি করবে!

ক'টা ব্যাণ্ড, স্যার ?' চামড়ার কেসে আঙুল বুলাচ্ছে ও, যেন আদর করছে।

কয়েক কদম এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো লিলিয়ান। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না। রানা হয়তো চাইছে না এর মধ্যে নাক গলাক সে।

মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে রানা। ছি, ছি—এ-ধরনের একটা সিন ক্রিয়েট করা উচিত হয়নি। না তাকিয়েও লক্ষ্য করলো, সবাই বিরক্ত হয়েছে ওর আচরণে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব।

লোকটা বললো, 'ক'টা ব্যাণ্ড তা জেনে আপনার কি দরকার ? দিন, আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে!'

শব্দ করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। দু'জন পুরুষ, আর একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

'দুঃখিত,' ম্লান কণ্ঠে বললো রানা 'উচিত ছিলো আপনার অনুমতি নিয়ে···।'

রেগেমেগে রানার দিকে পিছন ফিরলো লিলিয়ান।

ছোঁ দিয়ে রেডিওটা নিতে গেল লোকটা। কিন্তু রানা ছাড়লো না। চামড়ার কাভারের নিচে, রেডিওর এক কিনারায়, ছোট্ট একটু জায়গা ফুলে আছে।

ঝট্ করে এলিভেটরের দিকে তাকালো রানা। ঠিক এই সময় রেডিওটা নেয়ার জন্যে আবার ছোঁ দিলো লোকটা। ফোলা জায়গাটার ওপর আঙুল চেপে রেখেছিল রানা, চাপ পড়লো তাতে।

বিস্ফোরিত হলো এলিভেটর।

দশ

মনে হলো গোটা হোটেলটাই বিধ্বস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠলো রানা, কিন্তু ছিটকে পড়লো রেডিওর মালিক দু'হাত দিয়ে ওর বুকে ধাক্কা দেয়ায়। স্লো-মোশন ছায়াছবির মতো ঘটতে লাগলো ঘটনাগুলো। সাদা আর কালো ধোঁয়ায় এলিভেটরের সামনে লিলিয়ান সহ আরো তিনজন ঢাকা পড়ে গেল। ঘন ধোঁয়ার ভেতর দরজা আকৃতির একটা আগুন দেখতে পেলো রানা, বুঝলো এলিভেটরের ক্যারিজ জ্বলছে। মেঝেতে ছিটকে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে ও, পকেট থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তলটা, কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হলো—ধাক্কা খেয়ে যেখানে পড়েছিল রানা সেখানকার মেঝের ছাল তুলে দেয়ালে গিয়ে লাগলো বুলেটটা। এলিভেটরের সামনে থেকে আহতদের গোঙানি ভেসে এলো।

রিসেপশন হলের দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফেরালো রানা, মেঝেতে কনুই রেখে পিস্তলের ট্রিগার টিপলো। সুবেশী লোকটার কোটের প্রান্ত ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

শূন্যে একটা খবরের কাগজ উড়তে দেখলো রানা। প্রৌঢ় লোকটা

দরজার কাছে পৌঁছে, হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে কাগজটা। গুলি করতে যাবে রানা, ওর ঘাড়ের ওপর আছাড় খেলো কে যেন। দরজার চৌকাঠে লাগলো বুলেট। বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

ঝট্‌কা দিয়ে শরীরটাকে সরাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। নরম একটা শরীর।

'চলো, পালাই!' ফুঁপিয়ে উঠলো লিলিয়ান।

তাকে ধরে দাঁড় করালো রানা। এতোক্ষণে হাতের শপিং ব্যাগটা ফেলে দিলো লিলিয়ান। এক হাতে তার কব্জি ধরলো রানা, আরেক হাতে শপিং ব্যাগটা তুললো। ব্যাগের মুখ গলে মেঝেতে পড়ে গেল বইটা।

শপিং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, এক হাতে পিস্তল, অপর হাতের ভাঁজে লিলিয়ানকে নিয়ে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। হোটেলের চওড়া গেট দেখা গেল দূরে, কালো একটা মার্সিডিজ তীর বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গ্যারেজ থেকে মাস্টাং নিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা দেখলো, তিনজন আহত মানুষকে ধরাধরি করে রিসেপশন থেকে বের করা হচ্ছে। এই তিনজনই এলিভেটর থেকে নেমেছিল।

'কোথায় লেগেছে তোমার?'

'কোথাও না,' বললো লিলিয়ান, চোখ মুছলো রুমাল দিয়ে। আহতদের দিকে তাকালো সে। কারো আঘাতই মারাত্মক নয়, তবে তিনজনই খোঁড়াচ্ছে। শুধু একজনের নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখা গেল। 'আমার সামনে ওরা ছিলো বলে...আমি শুধু ছিটকে পড়ে যাই...রবিন, ওরা আমাদেরকেই...তাই না?'

'হ্যাঁ।' উঁচু আর শক্ত হয়ে উঠলো রানার চোয়ালের হাড়। হোটেলের গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মাস্টাং। ও জানে, একা শুধু ওকে নয়, ওদের দু'জনকেই খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিলিয়ান একা এলিভেটরে চড়লে লোকটা হয়তো রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিতো না। দু'জন একসাথে চড়লে দিতো। ও কখন একা এলিভেটরে চড়ে তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতো না আততায়ী।

একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে জানে রানা। লিলিয়ান এই হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত নয়। আমেরিকানরা এর সাথে জড়িত নয়। স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট ছিলো ওরা? নাকি রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স—জি. আর. ইউ.?

সবচেয়ে ভীতিকর প্রশ্নটা হলো, আততায়ীরা ওদের ঠিকানা জানলো কিভাবে?

সাগর থেকে উঠে আসার পর ওকে বা ওর সাথে দেখা হবার পর লিলিয়ানকে কেউ অনুসরণ করেনি। এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত।

তাহলে?

'কি ভাবছো?'

সাইরেন বাজাতে বাজাতে পুলিশের দুটো গাড়ি ছুটে গেল হোটেল স্যাভয়ের দিকে, পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। রানা বললো, 'গাড়িটা আর ব্যবহার করা উচিত হবে না।'

'টোয়েনটি-সেভেনথ্ এভিনিউ, অ্যাভিস কোম্পানী—চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি।'

'ভাবছি…।'

'জানি। ওরা জানলো কিভাবে কোথায় আছি আমরা।'

'এনি আইডিয়া ?'

মাথা নাড়লো লিলিয়ান। 'কেউ আমাদের অনুসরণ করলে টের পেতাম।'

'যে ভাবে হোক জেনেছে,' বললো রানা। 'কিভাবে, বুঝতে না পারা পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই।'

রানার মতো লিলিয়ানও চিন্তিত। 'জানি।' একটু পর জিজ্ঞেস করলো, 'নতুন কোনো প্ল্যান করছো ?'

'গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে গোল্ডেন ইন হোটেলে উঠবো। টাকা পাবার পর ওখানে তুমি ফোন করে মেসেজ দেবে। আগের প্ল্যানই ঠিক থাকলো।'

হঠাৎ জানতে চাইলো লিলিয়ান, ারা দায়ী, রবিন ? ওদের পরিচয় কি ?'

'আমেরিকানরা হতে পারে ?'

'আমার তা মনে হয় না।'

'আমারও।'

'যদি ধরেও নিই, ওরা তোমার সম্পর্কে জেনে ফেলেছে,' বললো লিলিয়ান, 'তাহলেও তোমাকে ওদের মারতে চাওয়ার কোনো কারণ নেই। বড় জোর ওরা তোমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করতে পারে।'

'তোমার সাথে আমি একমত।'

'তাহলে ?'

'নিজেই বোঝার চেষ্টা করো। পার্টি তো খুব বেশি নয়।'

'কে. জি. বি. নয়, কারণ ওরাই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে আমাদেরকে,' বললো লিলিয়ান। 'স্ট্যালিনপন্থীরা ?'

‘ডালচিমস্কি:কে ধরার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে, ওদের তা জানার কথা নয়।’

‘ডালচিমস্কি !’

‘হ্যাঁ।’

‘যার খোঁজে এসেছো তুমি··· ?’

‘হ্যাঁ।’

ব্যাপারটা হজম করার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো লিলিয়ান। ‘তাহলে বাকি থাকলো শুধু,’ একটু পর বললো সে, ‘গ্রু।’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার ধারণা··· ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু কেন ?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান। ‘ওরা চায় না ডালচিমস্কি ধরা পড়ুক ?’

‘তা হয়তো চায়। কিন্তু আমাকে পাঠানোটা ওদের হয়তো পছন্দ হয়নি। হয়তো আমার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই। ক্লাসিফায়েড অনেক তথ্য জানি আমি—ওরা হয়তো ভাবছে, সেগুলো আমি আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি। ডালচিমস্কি যেমন বিপজ্জনক, আমাকেও সেরকম বিপজ্জনক বলে মনে করছে।’

‘কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারকে ব্যাপারটা জানানো দরকার,’ বললো লিলিয়ান। ‘ওরা নিশ্চয়ই মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ভুলটা ধরিয়ে দেবে।’

‘গ্রু ভুল করে এ-সব করছে না,’ তিক্ত হাসলো রানা। ‘বুঝে-শুনে করছে। ওরা ওদের নিজস্ব নীতিতে চলে, বেশিরভাগ সময়ই

কে. জি. বি.-র প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুমোদন করে না।'

'কিন্তু তা কি করে হয়!' প্রতিবাদের সুরে বললো লিলিয়ান। 'নিজেদের লোকেরা আমাদের মারার চেষ্টা করবে, আমরা তাহলে কাজ করবো কিভাবে?'

শান্ত ভাবে বললো রানা, 'এরই নাম এসপিওনাজ। বা বলতে পারো প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব। শান্তির দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে আমাকে, আর শান্তির শত্রু স্বপক্ষ বিপক্ষ সবখানেই আছে। ওদের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।'

চেহারায় রাগ আর অসহায় ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর লিলিয়ান বললো, 'গ্রু কি করছে, হেডকোয়ার্টার তা জানে না বলতে চাও? ওরা আমাদের সাবধান করেনি কেন?'

'যোগাযোগ করার নির্দিষ্ট সময় আছে,' বললো রানা। 'তখন হয়তো করবে।'

রেন্ট-এ-কার কোম্পানী অ্যাভিসে মাস্টাং রেখে ট্যাক্সি নিলো ওরা। গোল্ডেন ইনের সাত তালায় ডাবল বেডের একটা কামরা ভাড়া করলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় ছাড়লো লিলি-য়ান, নাইট-ড্রেস পরে শুয়ে পড়লো বিছানায়। গায়ে চাদর টেনে উপুড় হলো সে।

ঘরে শুধু শেড পরানো টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে কার্পেটের ওপর পায়চারি করছে রানা। গালে হাত দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লিলিয়ান। তাকিয়ে আছে, আর কি যেন চিন্তা করছে।

'শোবে না?' দশ মিনিট পর জিজ্ঞেস করলো সে।

'ঘুম আসবে না।' সিগারেট ধরালো রানা।

'আমাকে একটা দেবে ?'

বিছানার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। লিলিয়ানকে সিগারেট দিয়ে বিছানার কিনারায় বসলো। হেলান দিলো বালিশে।

লিলিয়ানের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অপর হাতটা রানার বুকে রাখলো সে।

'লিলি, তোমার হাত কাঁপছে!' সিধে হলো রানা।

'এতোক্ষণ আমরা লাশ-কাটা ঘরে থাকতাম, তাই না ?' ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান। 'ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে আমরা বেঁচে আছি।' শিউরে উঠলো সে।

'এরপরের বার হয়তো থাকবো না,' নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে গেল রানার কণ্ঠস্বর।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লিলিয়ান। কয়েক সেকেণ্ড পর বিড়বিড় করে বললো, 'আমরা স্যাভয়ে উঠেছি ওরা জানতো, সেজন্যে তুমি আমাকে দায়ী ভাবছো ?'

'তোমার কানের দুল জোড়া,' শুকনো গলায় বললো রানা, 'অস্বাভাবিক বড়।'

কেঁপে উঠলো লিলিয়ান। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে, 'হ্যাঁ।'

'আমি তাহলে ঠিক ধরেছি ?' কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করলো রানা।

উঠে বসলো লিলিয়ান। কান থেকে দুল জোড়া খুলে রানার হাতে গুঁজে দিলো। বাঁ হাতের তালু থেকে একটা দুল ডান হাতে নিলো রানা। দুটোর ওজন অনুভব করলো। একটা হালকা, অপরটা একটু ভারী।

হালকাটা লিলিয়ানকে ফেরত দিলো রানা, ভারীটা নিয়ে বিছানা ছাড়লো। টেবিল ল্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলো সেটা। পিনের মাথার মতো ছোট্ট একটা বোতাম রয়েছে, চাপ দিতেই টোপর আকৃতির তুল দু'ফাঁক হয়ে গেল, ভেতর থেকে খসে পড়লো অতি ক্ষুদ্র একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। দেখেই চিনতে পারলো রানা—রাশিয়ার তৈরি ব্লিপার—সিগন্যাল পাঠানোর অত্যাধুনিক যন্ত্র। অন করা অবস্থায় অনবরত পিপ-পিপ সিগন্যাল পাঠিয়ে চলেছে, কিন্তু আওয়াজটা শুধু রিসিভারে শোনা যাবে। এতো শক্তিশালী ব্লিপার জাপানী বা আমেরিকানরাও তৈরি করতে পারেনি, দেড় হাজার মাইল দূরের রিসিভারও সিগন্যাল রিসিভ করতে পারবে। রাশিয়ানদের এই ব্লিপার আমেরিকা সহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক ইন্টেলিজেন্সও ব্যবহার করে বলে শুনেছে রানা।

ওর পিছনে এসে দাঁড়ালো লিলিয়ান। রানার কাঁধে একটা হাত পড়লো। 'কিছু বলছো না যে ?'

হাসতে চেষ্টা করলো রানা। 'কে. জি. বি. রেসিডেন্টের নির্দেশ তুমি অমান্য করতে পারোনি, তাই না ?'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপলো লিলিয়ান। 'হ্যাঁ। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে এটার সাহায্যে আততায়ীরা জানতে পারে আমরা স্যাভয়ে উঠেছি, তাহলে…তাহলে এ-ও ধরে নিতে হয় যে রেসি-ডেন্ট আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছেন। তা কি করে হয়, রবিন ?'

'রেসিডেন্ট কয়েক শো লোককে নিয়ে কাজ করেন,' বললো রানা। 'তাদের মধ্যে দু'একজন স্ট্যালিনপন্থী বিদ্রোহী থাকতে

পারে না?'

'রেসিডেন্ট স্বয়ং নন, তুমি জোর করে বলতে পারো?'

'মস্কো পুরোপুরি নিঃসন্দেহ না হয়ে ওই লোককে ওয়াশিংটন দূতাবাসে কালচারাল অ্যাটাশে করে পাঠায়নি,' বললো রানা। 'ওই লোকের পক্ষে বেঈমানী করা সম্ভব নয়, কারণ তা করলে নিশ্চয়ই রাশিয়ায় তার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে বলে জানে সে।'

'তুমি চাও রেসিডেন্টকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলি যে তার দলে বেঈমান আছে?'

স্লিপারটা আগেই অফ করছে রানা, কার্পেট খানিকটা সরিয়ে মেঝেতে ফেললো সেটা, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করলো। 'দরকার কি? রেসিডেন্ট সতর্ক হয়ে গেলে বেঈমানটা বা বেঈমান-রাও সতর্ক হয়ে যাবে। তারচেয়ে আগে আমাদের কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ হোক, মস্কোয় ফেরার আগে রেসিডেন্টের সাথে আমি নিজে কথা বলবো।'

'দায়িত্ব কমে যাওয়ায় অনেক হালকা হয়ে গেলাম আমি,' বললো লিলিয়ান।

'তা বটে,' মনে মনে হাসলো রানা। কিন্তু জানে, রহস্যের কোনো মীমাংসাই হলো না।

ওকে আবার সিগারেট ধরাতে দেখে বাধা দিলো লিলিয়ান। হাত থেকে সিগারেট আর লাইটার কেড়ে নিয়ে বললো, 'না। শোবে চলো। তুমি না শুলে আমার ঘুম আসবে না।'

জুতো খোলার আগে শপিং ব্যাগটা আতিপাতি করে খুঁজলো রানা।

‘কি খুঁজছো?’ হাসি চেপে বিছানা থেকে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

‘বইটা গেল কোথায়?’

লিলিয়ানের সুরেলা হাসিতে ভরে উঠলো ঘর। ‘ব্যাগ থেকে ওটা পড়ে গেছে, স্যাভয়ের রিসেপশনে।’

‘হায় হায়! পড়ে যেতে দেখলে অথচ তুললে না?’ ব্যাগ রেখে বিছানায় এসে বসলো রানা।

‘আসলে ওটার দরকার আছে কি?’ পাল্টা প্রশ্ন করলো লিলি-য়ান। চাদরের নিচে ঢুকে গেল সে, শুধু মুখটা বাইরে থাকলো। ‘বই দেখে রান্না করা যায় বটে, কিন্তু সে রান্না কি খাবার উপযুক্ত হয়?’

‘তাহলে প্রেজেন্ট করেছিলে কেন?’ বালিশে মাথা দিয়ে শুলো রানা, চাদরের তলায় ঢুকছে।

‘বলতে পারো ফাঁদ পেতেছিলাম,’ চাদরের নিচে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান।

‘সে ফাঁদে আমি কি ধরা দিয়েছি?’

জবাব না দিয়ে শরীরটাকে দ আকৃতির মতো করে রানার বুকে মুখ লুকালো লিলিয়ান। চিবুকটা ঠেকে আছে রানার বুকে, নাকটা গলার কাছে, একটা হাত রানার বগলের নিচ দিয়ে পিঠে চলে গেছে, অপর হাতটা রানার কাঁধ আর বালিশের মাঝখান দিয়ে মাথার চুল ছুঁয়েছে।

অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। বার কয়েক কেঁপে কেঁপে উঠলো লিলিয়ান, দু'চার বার উঁ-আঁ করলো, তারপর তার আর কোনো সাড়া পেলো না রানা। মনে মনে হাসলো ও। মস্ত একটা ফাঁড়া কেটেছে লিলিয়ানের, বিপুল স্বস্তিবোধ ক্লান্ত করে তুলেছে তাকে।

এগারো

‘সাবধানে থেকো, রবিন,’ বলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো লিলিয়ান, রানার ঠোঁটে হালকাভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে পিছিয়ে গেল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করলো রানা, কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো এক মিনিট। চিন্তিত।

মনে মনে জটিল একটা অংক মেলাবার চেষ্টা করলো ও। আপন-মনে মাথা ঝাঁকালো—ও যা করছে ঠিকই করছে। প্ল্যান বদল করতে হলে আরো অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হবে ওকে।

টিভি খুলে বাথরুমে ঢুকলো রানা, ব্রেকফাস্ট সেরে আরেকবার দাঁত ব্রাশ করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় দিনের প্রথম দুঃসংবাদটা কানে এলো।

ব্রাজিলে প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে, তার ওপর এন. বি. সি. রিপোর্টার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর ঘোষণা করলো, কাল বিকেলে চ্যানিউটে যা ঘটেছে তার রহস্য ভেদ করার জন্যে ক্যানসাস আর ফেডারেল পুলিশ এখনো জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ‘অন্তর্ঘাতক

বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার পরিচয় এখনো জানা যায়নি। গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে সে, কখন কি হয় বলা যায় না। কাল রাতে হেলিকপ্টারে করে ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে, ওখানকার সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার।' সবশেষে রিপোর্টার আরো বললো, 'পরিচয় উদ্ধার করা না গেলেও, পুলিশ তার নীল মটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর চেক করে দেখছে।'

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল রানার। লোকটার তো ধরা না পড়ে সুইসাইড পিল খাবার কথা, খায়নি কেন?

সামরিক হাসপাতাল, ওখান থেকে কাউকে বের করে আনা সহজ কথা নয়। ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন যদি বেঁচে যায়, তার মুখ খোলার আশংকা থেকেই যাবে। সোডিয়াম পেণ্টোথাল বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করবে আমেরিকানরা, ব্যস, বকবক করে সব ফাঁস করে দেবে ইলিয়টসিন। অন্যান্য টেলি-বম বা তাদের টার্গেট সম্পর্কে সে যদি কিছু না-ও জানে, আমেরিকানরা অনায়াসে তাদের অস্তিত্ব আন্দাজ করে নেবে।

কাজেই ইলিয়টসিনের মুখ বন্ধ করার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে।

এসব কি ভাবছি আমি, নিজেকে তিরস্কার করলো রানা। একশো ছত্রিশজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তাদের খুন করতে নয়। কিন্তু ইলিয়টসিন মারাত্মক একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?

তা বটে। সুতরাং চিন্তা করে দেখো কিভাবে তাকে সামরিক হাসপাতাল থেকে বের করে আনা যায়। হ্যাঁ, কাজটা কঠিন। কিন্তু

একেবারেই অসম্ভব কি ?

ওরা তাকে কড়া পাহারায় রেখেছে। তাকে বের করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করতে চাওয়া।

মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি ! ব্যাটা সুইসাইড পিল খায়নি কেন !

সুটেডবুটেড হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো রানা। সুপার-মার্কেটে এসে একটা রেডিমেড গার্মেন্টের দোকানে ঢুকলো। তিনটে শার্ট, অতিরিক্ত আণ্ডারওয়্যার আর মোজা, একটা স্পোর্টস জ্যাকেট, ধুয়েই পরা যায় এক জোড়া স্ল্যাকস, সাদা ক্যানভাস ডেক শু, আর ব্রাউন লোফার কিনলো। থার্ড এভিনিউয়ে বেরিয়ে এসে খাঁটি সিল্কের রঙচঙে কিছু টাই দেখলো একটা দোকানের শো-কেসে, আঠারো ডলার দিয়ে এক জোড়া কিনলো—নীল আর লাল। এই একই মানের জিনিস মস্কোয় থাকতেও কিনেছিল, প্রায় অর্ধেক দামে। হোটেলে ফিরে এসে প্রথমেই চেক করলো কামরার কোথাও সাব-মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক লিস্‌নিং ডিভাইস রোপণ করা হয়েছে কিনা।

হোটেলের রেস্তোরাঁয় নেমে এসে এক কাপ কফি খেলো রানা। গ্যাম্বলিং হলে ঢুকে রুলেৎ টেবিলে পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরে ভাগ্য পরীক্ষা করলো। হেরে গিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো এই বলে যে পরে এক সময় লোকসানটা পুষিয়ে নেয়া যাবে।

সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রালটা একবার চেক করে দেখা দরকার। বিশেষ করে ভেতরের লে-আউট। এ-ধরনের কাজ খুব গুরুত্বের সাথে নেয় রানা, আলসেমি করে এড়িয়ে যায় না। আজও বেঁচে আছে ও, তার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা।

ক্যাথেড্রালে যারা প্রার্থনা করতে যায় তাদের নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই রানার। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে ওর, অনেক ক্যাথেড্রালেই গুপ্তচররা পরস্পরের সাথে দেখা করে, মেসেজ আদান-প্রদান করে, এমনকি অ্যামবুশও পেতে রাখে।

ব্রডওয়ে আর এইটথ এভিনিউয়ের মাঝখানে ফরটি-সেকেণ্ড স্ট্রীট। ফেরারী, নেশাখোর, পতিতা, বখাটে কিশোর, ছেঁড়া কম্বল গায়ে আশ্রয়হীন বৃদ্ধা, আধ-পাগল, অবহেলিত পংগু, পর্ণোগ্রাফীর ঝোলা হাতে ফেরিওয়ালা, আর কৌতূহলী ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগেই আছে। ভিড় ঠেলে হন হন করে হাঁটতে লাগলো রানা, কারো চোখে সরাসরি তাকালো না। রসুন আর ে াড়া চর্বির গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো। এইটথ এভিনিউ পেরিয়ে এসে স্যাৎ করে গান শপে ঢুকে পড়লো ও। রাস্তার ধারে শো-কেসে আশ্চর্য সব অস্ত্র -- গুর্খা ছুরি, ব্রিটিশ লী-এনফিল্ড রাইফেল, সেমি-অটোমেটিক কারবাইন, দেখতে অনেকটা ইউ. এস. আর্মি-র এম-ফরটিনের মতো।

রানার একটা হান্টিং রাইফেল দরকার, যেন দুশো গজ দূর থেকে একজন মানুষকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। দেখে-শুনে একটা উইনচেস্টার পয়েণ্ট টু সেভেন জিরো পছন্দ হলো ওর। সাথে রয়েছে একটা ভ্যারিয়েবল রেডফিল্ড স্কোপ, নাইন পাওয়ার পর্যন্ত ম্যাগনিফিকেশন। একটা শোল্ডার-স্লিং, গান ব্যাগ আর দুই বাক্স শেলও কিনলো। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না, গুণ গুণ করতে করতে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

ডুলাথে বেন কুইকের বিধবা স্ত্রীকে জেরা করছে ফেডারেল এজেন্টরা —এবার নিয়ে নয় বার। বিল, ক্যাশমেমো, আইডেনটিটি কার্ড,

বীমা পলিসি, পাসপোর্ট, বাতিল চেক—বেন কুইকের যাবতীয় কাগজ-পত্র টেবিলের ওপর স্তূপ করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি-দের সাথে যতোটা সম্ভব সহযোগিতা করছে মিসেস কুইক। পাইলট স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে কেন তারা এতো কথা জানতে চাইছে তা তার বোধগম্য হলো না। বিয়ের আগে তার স্বামী কোথায় ছিলো, কেমন ছিলো—এসব প্রশ্নের বিশদ বিবরণ কি তার পক্ষে দেয়া সম্ভব? বুত আন্তরিকতার সাথেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে। স্যোশাল সিকিউরিটির পেনশন স্কীমের কল্যাণে মাসে মাসে যে টাকাটা তার পাবার কথা, স্বামীর অবর্তমানে বেঁচে থাকার বিরাট একটা ভরসা হতে পারে সেটা। কাজেই ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো এই সরকারী লোকদের অসন্তুষ্ট করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সেই একই কথা আবার তাদেরকে বললো সে—বেন কুইকের কৈশোর কেটেছে মিনিয়াপোলিসে, হাইস্কুলের পড়াশোনাটা সেখানেই শেষ করে সে। তারপর কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, ওখানে দু'বছর থাকার সময়ই প্লেন চালাতে শেখে…।

'সাপ্তাহিক মিটিঙে কি আলোচনা হলো?' সি. আই. এ. হেড-কোয়ার্টার, ল্যাংলি—বসের ঘরে ঢুকে জানতে চাইলো কমপিউটর বিজ্ঞানী চ্যারিটি উডস্টক।

'ঘোড়ার ডিম আলোচনা হলো!' কর্নেল জিল ক্যাসেল তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলো। প্রতি সোমবার ওয়ার্কিং গ্রুপ সিক্স পেন্টাগনে এই মিটিঙে বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টা ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে তাতে।

'বিগ রড বা বিটার ক্যাণ্ডি সম্পর্কে নতুন কিছু?' জানতে চাইলো

উডস্টক, অপারেশন তুটোর কোড নেম উচ্চারণ করলো সে।

'ইতিমধ্যে যা জেনেছি তারচেয়ে বেশি কিছু না। ও. এন. আই.-এর এক ভাঁড় একটা রিপোর্ট পড়ার সময় এমন ভান করলো যেন সসার বা ওই জাতীয় কিছু প্রত্যক্ষ করেছে সে। লং আইল্যাণ্ডের কাছ ঘেঁষে একটা সাবমেরিন নাকি গেছে। ওরা রেডিও সিগন্যালও টেপ করেছে—কোথাকার কে এক রোমিও সম্পর্কে। কোডেড সিগন্যাল, এন. এস. এ. এক্সপার্টরা কোড ভেঙেছে। সবাই ভারি উত্তেজিত। কিন্তু আমি মাতিনি।'

'রেগে জাননি তো?' উকিলের মতো কৌশলে প্রশ্ন করলো উডস্টক।

'আরে না, একেবারে অবোধ বালকের মতো ঠাণ্ডা ছিলাম, চ্যারিটি!'

চ্যারিটি উডস্টকের চোখ জোড়া ক্ষীণ একটু বিস্ফারিত হলো। মনে মনে ভাবলো, বেহায়া লোকটা জানে ফার্স্ট নেম ধরে ডাকলে বিরক্ত এবং অস্বস্তি বোধ করে সে, তবু হালকা পরিবেশের সুযোগ নিতে কখনো তার ভুল হয় না। লোকটা যদি আমার বস না হতো রে! দেখো কি সাহস, আবার আমার নতুন ব্রেসিয়ারের দিকে কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে! আমার ধারণাই ঠিক, লোকটা মানসিক প্রতিবন্ধী।

'আর্মি খুব হাঁক-ডাক ছাড়লো, তারা নাকি হাওয়াই-এর কাছে চীনের তৈরি কিছু অস্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। আর এয়ারফোর্সের গর্ব হলো, মিলিয়ন ফিট ওপর থেকে আরো কিছু ছবি তুলেছে তারা। এই কাজটা খুব ভালো পারে ওরা, ছবি তুলতে। ভাবনার কিছু নেই, আগাগোড়া নির্বোধ সেজে বসে ছিলাম আমি। ঘন ঘন

শুধু মাথা ঝাঁকিয়েছি। ভুল একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি। বরং ওদের আমি কিছু উপাদেয় খোরাক সাপ্লাই দিয়েছি, যাতে আমাদের ব্যাপারগুলো থেকে মনোযোগ ছুটে যায়। নতুন পোলিশ অ্যাটাশে আসছে, মায়ামিতে একটা ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, ইত্যাদি। কাজ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে সবাই।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'তোমার এদিকে খবর কি? সংকটের কোনো আভাস পাচ্ছো?' চট্ করে একবার কমপিউটার বিজ্ঞানীর বুকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো জন ক্যাসেল।

'বেন সুইটল্যাণ্ড ফোন করেছিলেন।'

'নিপাট ভদ্রলোক,' মন্তব্য করলো কর্নেল, হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে চুরুট বের করলো একটা।

'বেন সুইটল্যাণ্ড সি. আই. এ. ডিরেক্টরের পার্সোন্যাল অ্যাসি-স্ট্যাণ্ট, এবং একটা ইতর, ঠিক আপনার মতো,' শেষ শব্দ তিনটে মনে মনে বললো চ্যারিটি উডস্টক।

মাথা ঝাঁকালো জন ক্যাসেল, নীলচে ধোঁয়া ছাড়লো সিলিঙের দিকে। 'আমিও তাই বোঝাতে চেয়েছি—সব কথাই কি আমরা উল্টো করে বলছি না?' মধুমাখা হাসি উপহার দিলো সে। 'তা, কি চায় সে?'

'বললো, ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন...,' বাধা পেয়ে থেমে গেল চ্যারিটি উডস্টক। দরজায় নক হচ্ছে।

'ইয়েস, কাম ইন,' ধমকের সুরে বললো কর্নেল।

'আমি চ্যাপেল, স্যার,' দরজা সামান্য একটু খুললো প্রথমে, বাইরে থেকে ভেসে এলো সবিনয় কণ্ঠস্বর। 'কন্ট্রোল রুমে কাজ

আছে, আমার একটা পাস দরকার ছিলো …।' ভেতরে উঁকি দিলো চ্যাপেল।

'এখন নয়, পরে—যাও!'

বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'হ্যাঁ।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকলো জন ক্যাসেল।

'ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন,' বললো উডস্টক, 'আপনার কাজিনের কাছ থেকে আপনি কোনো খবর পেয়েছেন কিনা।'

'তুমি কি বললে, চ্যারিটি?' ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে নিজের সামনে ধোঁয়ার একটা আড়াল তৈরি করলো জন ক্যাসেল।

'বললাম, কোথায় আছে তা আমরা জানি। সময় মতো বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাবো।'

'গু-উ-উ-ড! এই, ভালো কথা, তোমাকে আমি চ্যারিটি বলে ডাকলে তুমি আবার কিছু মনে করো না তো?'

'মনে করলেই বা কি? সবাই কি আর বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারে? তবে নাম নিয়ে ততোটা মাথা-ব্যথা আমার নেই। আমি সম্পর্ক আর মর্যাদার গুরুত্ব দেই।'

'আমিও তোমারই দলে। আমি চাই না তুমি ভাবো সম্পর্কটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনছি।' কথা শেষ করে চ্যারিটি উডস্টকের নতুন ব্রেসিয়ারের ওপর আরেকবার চোখ বুলালো সে।

রাইফেল নিয়ে গোল্ডেন ইনে ফিরলো না রানা। ওয়েস্ট ফরটি-সেকেণ্ড স্ট্রীটে অ্যাভিসের একটা শাখা রয়েছে, ব্লু প্লাস্টিক মোড়া আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড দেখিয়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত একটা ডজ-ওয়াগন ভাড়া করলো। পিছনের কমপার্টমেন্টে রাইফেল আর শেল

ভরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

কেনাকাটা শুরু করলো রানা। দেড় ঘণ্টা ধরে পাঁচ-সাতটা দোকানে অভিযান চললো। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রে ঠাসা নতুন স্যুটকেস নিয়ে এইটথ্ এভিনিউয়ের বব হাডসন মোটেলে উঠলো ও। বিপদের মধ্যে আছে, এলিভেটরকে ভয় করা উচিত বলে তিন-তালার একটা কামরা পছন্দ করলো। ইমার্জেন্সির সময় যদি পালা-বার দরকার হয়, এক ঝুল-বারান্দা থেকে আরেক ঝুল-বারান্দায় লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে আসা ওর জন্যে কঠিন হবে না। স্যাভয়ের ধারেকাছে না যাওয়াই ভালো, এখন থেকে বব হাডসনই ওর সেফ হাউস। স্যুটকেস খুলে তিনটে জিনিস বের করলো ও—দু'জোড়া মোটোরোলা ওয়াকি টকি, ব্যাটারিচালিত এ. এম./এফ. এম. রেডিও, আর আড়াইশো ডলার দিয়ে কেনা শর্টওয়েভ রিসিভার। সবশেষে টুল কিট বের করে এ. এম./এফ. এম. ইউনিটটাকে মডি-ফাই করতে বসলো। কাজটা শেষ করার পর এফ. বি. আই. যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে তা এখন শুনতে পাবে ও। দীর্ঘ কয়েক মিনিট একমনে শুনলোও রানা, কাজটায় কোনো খুঁত নেই বুঝতে পেরে সন্তুষ্টির ক্ষীণ হাসি দেখা দিলো ঠোঁটে। এরপর রানা টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে ওয়েস্ট টোয়েনটিয়েথ্ স্ট্রীটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

ওদিকে তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে মস্কোয়, ক্রোপতকিন স্ট্রীট থেকে জেনারেল কায়কোভস্কির খোলা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। চুরুটের গন্ধ আর ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে ঘরের পরিবেশ, দু'জনের চেহারাই ক্লান্তি আর উদ্বেগে ঝুলে পড়েছে। এই ঘরে আরো কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, কথাটা মনে

হওয়ায় এইমাত্র জানালাটা খুলে দিয়েছেন জেনারেল।

রাত জাগা লাল চোখ নিয়ে জানালার সামনে, জেনারেলের পাশে চলে এলেন কর্নেল বিকারেন, তাজা বাতাসে ভরে নিলেন ফুসফুস।

'খুব বেশি চুরুট খাচ্ছি, তাই না, আনাতোলি ?'

বিকারেন শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'ক্যানসাসে বেচারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অথচ আমরা তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।'

অবাক হয়ে ডেপুটির দিকে তাকালেন জেনারেল, তারপর আপন-মনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানালার দিকে পিছন ফিরলেন, ধীর পায়ে ডেস্কের পিছনে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করলেন। 'সিদ্ধান্ত তো অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে, আনাতোলি।'

'জ্বী!' আকাশ থেকে পড়লেন বিকারেন। 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে? তাহলে সারাটা রাত জেগে কি করছি আমরা ? কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, জেনারেল কমরেড ?'

'রাত জেগে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করছি, আনাতোলি। মাতৃ-ভূমির স্বার্থে সুইসাইড পিল খেয়ে মহিমান্বিত হবার সুযোগ ছিলো ইলিয়টসিনের, কিন্তু সে সুযোগ সে নেয়নি বা নিতে পারেনি। তাকে গৌরবান্বিত করার দায়িত্ব এখন আমাদের। এ-ব্যাপারে তোমার কোনো দ্বিমত আছে ?'

'না। কিন্তু দায়িত্বটা পালন করবে কে ? মানে কাকে দিয়ে আমরা কাজটা করাবো ?'

'রানাকে আমরা অনুরোধ করবো,' বললেন জেনারেল। 'সামরিক

হাসপাতালে ঢুকে একজন মানুষকে মৃত্যুর মহিমা দান করা, তারপর নিজের চামড়া বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসা, তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না-ও হতে পারে সে। তাই একই নির্দেশ আমরা রেসিডেন্টকেও দেবো।'

প্ল্যানটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন বিকারেন। মনে হচ্ছে ভালোই। মার্কিন সামরিক হাসপাতাল থেকে ইলিয়টসিনকে বের করে আনা কে. জি. বি. বা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকে মৃত্যুর মহিমা দান করাই ভালো।

'শুধু ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে নয়,' আবার বললেন জেনারেল, 'উদ্বেগে অস্থির বলেও রাত জাগছি আমরা, আনাতোলি।' এতোক্ষণে চুরুটটা ধরালেন তিনি। 'মেসেজটা তুমি আরেকবার পড়বে নাকি?'

এবার নিয়ে দশ কি এগারোবার পড়া হবে। রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে কে. জি. বি.-র নিজস্ব চর আছে, সেই পাঠিয়েছে এই মেসেজ। 'পুরোটা, জেনারেল কমরেড?' জিজ্ঞেস করলেন বিকারেন।

'অসুবিধে কি!'

ডেস্ক থেকে মেসেজ লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন বিকারেন, 'প্রথমে যে প্ল্যানটা ওরা করে, তার অংশবিশেষ জানিয়েছিলাম আপনাদের। একদিন পর প্ল্যানটা বদল করে ওরা, তার পুরোটা আমি জানতে পেরেছি। মাসুদ রানাকে ওরা ডালচিমস্কির চেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করছে। ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে দু'জনের একটা দলকে পাঠানো হয়েছে। রানার ব্যবস্থা করার জন্যে তিনটে গ্রুপকে জরুরী নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গ্রুপগুলো আমেরিকাতেই আছে। আর টেলি-বমগুলোকে অকেজো করার জন্যে মেক্সিকো থেকে চারটে কমাণ্ডো গ্রুপ অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। পেনিট্রেট করার জায়গা আর তারিখ আগেই জানিয়েছি।'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

চোখ বুজে শুনছিলেন জেনারেল, চোখ খুলে বললেন, 'প্রশ্ন হলো, রানাকে এ-সব তথ্য জানানো উচিত হবে কি?'

'বলেন কি, জেনারেল কমরেড!'

'জানালে নিজের গা বাঁচানোর জন্যে বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে ফেলবে সে,' বললেন জেনারেল। 'ডালচিমস্কিকে খুঁজবে কখন?'

'কিন্তু এ-সব না জানলে যে মারা পড়বে সে। মরহুম মাসুদ রান কোন্ কাজে আসবে আমাদের?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কে. জি. বি. চীফ। 'অকাট যুক্তি বটে। তাহলে এখনো তাকে আমরা জানাচ্ছি না কেন?'

'আজই তাকে মেসেজ পাঠাবার দিন···।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পক্বকেশ জেনারেল। 'ঘুমাতে যাচ্ছি, আনাতোলি। শুধু যদি খবর পাও মস্কোর দিকে মার্কিন মিসাইল আসছে তবেই আমার ঘুম ভাঙাবে।'

'আমিও আমার সহকারীকে সেই নির্দেশই দেবো,' তিক্ত হেসে বললেন বিকারেন। 'তবে আমার শুতে যেতে দেরি আছে।'

উইনচেস্টারের গর্জন চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো ওয়েস্ট টোয়েনটিয়েথ্ স্ট্রীটের শূটিং রেঞ্জটা বলতে গেলে নতুন তৈরি করা হয়েছে, শব্দ হজম করার সমস্ত আধুনিক উপকরণ সহ

তা সত্ত্বেও কান ফাটানো আওয়াজে চেম্বারের সবাই কেঁপে উঠলো। সাইট সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে আবার ফায়ার করলো রানা।

বুল'স আই। ডেড সেণ্টার।

খোলা বাক্সের ভেতর উঁকি দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন দেখতে পেলো রানা। রাইফেলের সাইট নিখুঁতভাবে অ্যাডজাস্ট করা গেছে, তবু বারবার গুলি করবে রানা শুধু নিশ্চিত হবার জন্যে যে পয়েণ্ট টু সেভেন জিরো যথাযথ 'টিউনড্' অবস্থায় আছে। রিলোড করলো রানা, তাক করলো, তারপর ফায়ার।

বুল'স আই

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

চকচকে শেল কেসগুলো পায়ের কাছে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে।

'নাইস শূটিং,' টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে বললো লোকটা, পরনে হুরঙা হাওয়াই শার্ট।

হেডসেট পরে আছে রানা, শুনতেই পেলো না। আবার ট্রিগার ানলো ও।

বুল'স আই, সেই সাথে খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। হেডসেট লে ফেললো রানা।

'ভেরি নাইস শূটিং,' আবার বললো লোকটা, 'বিশেষ করে এ- রনের একটা গান দিয়ে। এটা দিয়ে আপনি কি শিকার করেন?'

ফিরলো রানা, লোকটার পাশে একটা মেয়েও রয়েছে। সাদা

শর্টস, সাদা গেঞ্জি। আঠারো কি উনিশ, আন্দাজ করলো রানা। হাসলো ও। বললো, 'ভালুক···বনমানুষ···অ্যালিগেটর—মেয়ে ছাড়া আর সব কিছু!'

'মেয়েদের জন্যে ভারি দুঃসংবাদ,' সঙ্গীর উদ্দেশে চোখ মটকে বললো মেয়েটা। হাত ধরাধরি করে হাঁটা ধরলো ওরা।

সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকলো রানা। প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুলতা বাড়ছে। প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, এই সময় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হবার মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো মেয়েটা, ছোট্ট করে একবার হাত নাড়লো। হালকা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল রানার সারা শরীরে।

সেল কেসগুলো কুড়িয়ে পকেটে রাখলো রানা। কয়েক মিনিট পর রেঞ্জ থেকে বেরুবার সময় দারোয়ানের হাতে গুঁজে দিলো ওগুলো, রিলোড করার জন্যে কারো না কারো কাজে লাগবে।

বব হাডসন মোটেলে, নিজের কামরায় ফিরে এলো রানা। ঘাম শুকিয়ে গেলেও কেমন নোংরা নোংরা লাগছে নিজেকে। আরেকবার গোসল করলো। কাপড়চোপড় পরে হাতঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলালো। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। মস্কো যদি ওকে কোনো মেসেজ দিতে চায়, এখন থেকে ঠিক তিন মিনিট পর আগে থেকে ঠিক করা ফ্রিকোয়েন্সিতে দৈনিক শর্টওয়েভ নিউজ ব্রডকাস্ট-এর মাধ্যমে দেবে। হ্যালিক্রাফটার রিসিভারটা অন করলো রানা, ফ্রিকোয়েন্সি পেলো, তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খবরের প্রতিটি শব্দ শর্ট হ্যাণ্ডের সাহায্যে লিখে নিলো একটা কাগজে। মেসেজ থাকলে খবরের ভেতরই লুকিয়ে আছে। কোড ভাঙতে বসলো রানা।

দশ মিনিট পর সাংকেতিক মেসেজটার অর্থ দাঁড়ালো, 'ইলিয়টসিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন। আভাস পেয়েছি আপনার ওপর কমপক্ষে তিনবার হামলা চালানো হতে পারে। টেলি-বমগুলোকে অকেজো করার জন্যে গ্রু চারটে দল পাঠাচ্ছে, অন্য কোনো উপায় না দেখলে এফ. বি. আই.-এর হাতে ধরিয়ে দিন ওদের। ওরা...।'

এরপর জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ শহরে, কোন এয়ারপোর্টে, কবেকার কোন্ ফ্লাইটে আসবে দল চারটে।

কাগজটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালো রানা। রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে ওর। ইলিয়টসিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন মানে? ওরা কি তাকে কসাই বা খুনী বলে ধরে নিয়েছে? ইলিয়টসিন কে? তার সাথে ওর কোনো শত্রুতা আছে? কেন রানা তাকে খুন করতে যাবে? একজন দেশপ্রেমিক, দেশের সেবা করার জন্যে কে. জি. বি.-তে নাম লিখিয়েছিল। কে. জি. বি. তাকে স্যাবোটাজে ট্রেনিং দিয়ে আমেরিকায় পাঠায়। সেই থেকে আজ তেরো চোদ্দ বছর সম্মোহিত অবস্থায় ছিলো লোকটা। কারো কোনো ক্ষতি করেনি, সৎ জীবনযাপন করে এসেছে। হঠাৎ মূর্তিমান এক শয়তান তাকে টেলিফোন করলো, দম দেয়া পুতুলের মতো একটা ধ্বংসকাণ্ড ঘটিয়ে বসলো বেচারা—এক রকম বলতে গেলে নিজের অজান্তেই। অথচ রাশিয়ার সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাধেনি।

কি দোষ এই লোকের? কি দোষ এই একশো ছত্রিশ জনের?

উঁহুঁ, মাথা নাড়লো রানা। এ কাজ সে করবে না।

কিন্তু তারপরই ভাবলো, সে না করলে আর কাউকে দিয়ে কাজটা করাবে কে. জি. বি.। হয়তো ইতিমধ্যে রেসিডেন্টকেও প্রয়োজনীয়

নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইলিয়টসিনের প্রতি সহানুভূতি জাগছে। লোকটা সুইসাইড পিল খেলে সমস্যাটা দেখা দিতো না। গুলি খেয়ে মরে গেলেও পারতো। কিন্তু আত্মহত্যা করেনি বা নিহত হয়নি বলে এখন তাকে খুন করতে হবে?

ধীরে ধীরে একটা চ্যালেঞ্জ জাগছে রানার মনে।

কিন্তু সামরিক হাসপাতালে কিভাবে ঢুকবে সে? ঢুকতে যদি বা পারেও, লাভ কি তাতে? নিশ্চয়ই কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে ইলিয়টসিনকে। হাসপাতালে নাহয় ঢুকলো, কেবিনে ঢুকবে কি-ভাবে? আচ্ছা, ধরা যাক কেবিনেও ঢোকা সম্ভব, তারপর?

এতোক্ষণে রানা উপলব্ধি করলো, মস্কোও বাধ্য হয়ে ইলিয়ট-সিনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাসপাতালে ঢোকা সম্ভব হলে, কেবিনে ঢোকা সম্ভব হলে, লোকটাকে হয়তো মেরে ফেলাও সম্ভব। কিন্তু তাকে বের করে নিয়ে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল রানার।

এটা একটা মানবিক সমস্যা।

কিন্তু ঝুঁকিটা আত্মঘাতী।

এ-ধরনের ঝুঁকি তুমি আগেও নিয়েছো!

কিন্তু তা নিয়েছি স্বদেশের জন্যে। ইলিয়টসিন আমার কে?

একজন স্পাই। তোমার মতো। একজন দেশপ্রেমিক। তোমাদের পেশা এক।

এবং তার কোনো দোষ নেই। সচেতনভাবে সে কোনো অন্যায় করেনি।

আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে ভেবে দেখবো কি করা যায়। দু'এক-

দিনের মধ্যে এমনিতেও লোকটা মারা যেতে পারে।

মেসেজটা আরো বার কয়েক পড়ে মুখস্থ করে নিলো রানা। তারপর ছিঁড়লো, টুকরোগুলোয় আগুন ধরিয়ে পোড়ালো, সব-শেষে ছাইগুলো বেসিনে ফেলে ট্যাপের মুখ খুলে দিলো।

টেবিলের সামনে ফিরে এসে আবার কাগজ-কলম নিলো রানা। ইতিমধ্যে বিস্ফোরিত টেলি-বোমাগুলোর একটা তালিকা তৈরি করলো ও। তারপর ভাঁজ খুলে ইউ. এস. রোড ম্যাপের দিকে তাকালো। ইস্ট হ্যাম্পটন থেকে আসার পথে গ্যাস স্টেশন থেকে কিনেছিল এটা।

'কলোরাডো...মেইন...উইসকনসিন...ক্যানসাস,' ম্যাপের ওপর প্রতিটি জায়গা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো রানা। এই চার জায়গার টেলি-বম ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি। এখানে কোথাও একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না। কিন্তু ওর চোখে ধরা পড়ছে না। লোকগুলোর আসল নাম আগেই লিখেছে রানা, এবার আমেরিকান নামগুলো লিখলো। দুটো তালিকা পাশাপাশি রেখে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো। উঁহুঁ, কোনো তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। কাগজগুলো ছিঁড়ে পোড়ালো ও, ছাই ফেলে দিয়ে এলো বেসিনে।

চারটের সময় অপর রেডিওটা অন করে ডব্লিউ. সি. বি. এস. ধরলো রানা। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে নেটওঅর্ক নিউজ প্রচার করা হয় স্টেশনটা থেকে।

একটু পরই খবর শুরু হলো, 'সিনেটের অধিবেশন আবার কাল সকাল দশটায় বসবে। ক্যানসাস থেকে সি. বি. এস. রিপোর্টার চ্যানিউট অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানাচ্ছে।'

সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা।

'আগেই আপনাদের জানানো হয়েছে যে দু'দিন হলো কেউ এক-জন টেলিফোন কোম্পানীর লং-লাইন্স অপারেশনের মেইন সুইচিং সার্কিটগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। তদন্তে খুব একটা অগ্রগতি না হলেও কর্তৃপক্ষ মনে করছেন টিম পারকার-ই এই কাজের জন্যে দায়ী। এখনো তার জ্ঞান ফেরেনি, বিস্ফোরণের জায়গা থেকে নীল একটা মটরসাইকেল নিয়ে পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে গুরুতর-ভাবে আহত হয় সে। সামরিক হাসপাতালে কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে তাকে। কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে প্রকাশ, টিম পারকারের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ পাবার সমস্ত চেষ্টাই এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, টিম পারকার হয়তো তার আসল নাম নয়। এদিকে এফ. বি. আই.-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেসটা নিয়ে আলোচনা করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, কেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্টারদের কিছু জানাবার নাকি নিয়ম নেই। তবে আমাদের রিপোর্টার বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরে-ছেন যে বড়সড় একটা ফেডারেল টাস্ক ফোর্স ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, সংখ্যায় তারা বিশজনের কম নয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং জনমনে টিম পারকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এ-ধরনের একটা অপরাধ তার দ্বারা সম্ভবই নয়। সানডে স্কুল টিচাররা ডিনামাইট ফাটাবার ট্রেনিং পায় না। কথাটা সত্যি—টিম পারকার গত এগারো বছর ধরে একটা ব্যাপ্টিস্ট সানডে স্কুলে মাস্টারী করছিলেন... ।'

স্কুল মাস্টার? মনটা তেতো হয়ে গেল রানার। বোঝা গেল, কে. জি. বি. কর্মকর্তাদের কারো স্থূল রুচিবোধ এ-ব্যাপারটায় অবদান রেখেছে।

কিন্তু কারো সমালোচনা করে পার পাবার উপায় নেই। সমস্যার একটা সমাধান বের করতে হবে।

প্রথম কাজ জায়গা মতো পৌছানো। টেলিফোন বুকটা তুলে কোলের ওপর ফেললো রানা। টি. ডব্লিউ. এ.-র নম্বর বের করে ডায়াল করলো।

'টি. ডব্লিউ. এ.। মিস সিন্থিয়া। মে আই হেলপ ইউ?'

লিভেনওয়ার্থের ফ্লাইট সম্পর্কে প্রশ্ন করলো রানা। ওকে জানানো হলো, লিভেনওয়ার্থে টি. ডব্লিউ. এ.-র কোনো সার্ভিস নেই, কাছাকাছি উইচিটা শহরে আছে। লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে দিনে পাঁচটা ফ্লাইট উইচিটায় যায়, আরো দুটো যায় নেউয়ার্ক থেকে।

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো ও। তারপর আবার ফোনের রিসিভার তুলে মুখস্থ করা একটা নম্বর ডায়াল করলো। ভিনসেন্ট গগলকে দরকার ওর।

বারো

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের একটা অংশ আজও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে, দুর্গের মতোই দেখতে লাগে। কালের আঁচড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো

বুলডোজার দিয়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন, আধুনিক ইমারত তৈরি করা হয়েছে। কয়েক যুগ আগে ক্যানসাসের ধু-ধু সমতল প্রান্তরের মাঝ-মধ্যিখানে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গটা, চারপাশে তখন জনবসতির চিহ্নমাত্র ছিলো না। দৃশ্যটা আমূল বদলে গেছে, ফাঁকা জায়গা বলতে বাকি আছে শুধু দুর্গের ভেতর বিশাল উঠন, দুর্গের আশপাশে গিজ গিজ করছে আধুনিক দালান-কোঠা।

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ সামরিক হাসপাতাল, কাজেই সিভিলিয়ান-দের এখানে প্রবেশ নিষেধ। কড়া ভাঁজ করা উর্দি পরে যারা গেট পাহারা দেয়, তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, সাথে অনুমতি-পত্র থাকলেও সব লোককে তারা ভেতরে ঢুকতে দেয় না। অভিজ্ঞতা থেকে সিকিউরিটি অফিসারদের জানা আছে, প্রায় ক্ষেত্রেই পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালায় অশুভ শক্তি। তাই ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মেরামত করার সময় পিছনের দরজা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব রাখা হয়নি। পাশাপাশি দুটো চওড়া গেট, মাঝখানে বিশ গজ নিরেট পাথুরে পাঁচিল। প্রতিটি গেটের পাশে, ভেতর দিকে, একটা করে গেট হাউস। প্রতিটি গেট হাউসের দুটো অংশ। একটা অংশে রেডিও, ওয়্যারলেস, ফোন, ইত্যাদি রাখা হয়, সশস্ত্র প্রহরীরা বিশ্রামও নেয় এখানে। আরেক অংশে ভিজিটরদের বসানো হয়। ভিজিটরদের ওপর নজর রাখার জন্যে এখানেও থাকে সশস্ত্র প্রহরী।

গেট এ দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করে, গেট বি দিয়ে যান-বাহন। কোনো কোনো যানবাহনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না, অনুমতি পাওয়া গেলে আরোহীদের গেট এ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। প্রহরীদের পরিচিত হাসপাতাল কর্মী, নার্স, ডাক্তার, প্রশাস-

নিক কর্মকর্তা, ডেলিভারী ভ্যানের ড্রাইভার, এবং মেথরদের দেহ তল্লাসী করা হয় না বটে, কিন্তু সন্দেহ হলে তা করার অধিকার প্রহরীদের আছে। অপরিচিত সব লোকেরই দেহ-তল্লাসী করা হয়। ওষুধের বাক্স ভর্তি রেফ্রিজারেটর, অক্সিজেন ইকুইপমেণ্ট বা প্যাক করা অন্য কোনো ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, যেগুলো গেটে খুলে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলো ভেতরে নিয়ে যাওয়া বা ভেতর থেকে বের করা মহা ঝামেলার ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিশেষ অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রহরীরা গেটেই সব আটকে রাখে। ভিজিটররা চকলেট, ফুলমূল, বা ফুল নিয়ে আসে বটে, কিন্তু সবই বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখার পর ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। ঝামেলা পোহাতে হয় বলে বেশিরভাগ ভিজিটর খালি হাতেই রোগী দেখতে আসে।

শুধু গেটেই নয়, উঠনে এবং হাসপাতালের সবখানে সিকিউরিটি অফিসাররা নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়। বিসদৃশ কিছু চোখে পড়-লেই চেক করে তারা, যে কোনো লোককে থামিয়ে অনুমতি-পত্র চায়।

দুর্ভেদ্য একটা দুর্গই বলা চলে।

আজ বিকেলে, রানা যখন তার নিউ ইয়র্ক মোটেল কামরায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের বাইরে তখন তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীর কাছাকাছি। গোটা হাসপাতাল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, কাজেই ভেতরের তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রীর বেশি নয়। তবে দুশো এগারো নম্বর কেবিনে যারা রয়েছে পার্থক্যটা তাদের কাছে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না। বিছানায় পড়ে থাকা আহত লোকটার কষ্টের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শুধু পেটে

নয়, তার বুকেও কয়েকটা ফুটো তৈরি করেছে বুলেট। ডান কাঁধের হাড় উড়ে গেছে। ছিঁড়ে নিয়ে গেছে একটা কান। অর্ধ-সচেতন দেহটার সাথে অনেক ধরনের টিউব আর পাইপের সংযোগ দেয়ায় বেচারার ব্যথা-বেদনা আরো বরং বেড়েছে। অথচ উপস্থিত সাতজন মানুষের মধ্যে ভ্যানেসা রিকার্ড আর ডেরেক মারলো ছাড়া লোকটার ব্যাপারে কারো কোনো সহানুভূতি বা দরদ নেই। ভ্যানেসা রিকার্ড সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন নার্স, একহারা গড়নের সরলমতি নীলনয়না। আর ডেরেক মারলো একজন মেজর, সেই সাথে একজন সার্জেন, এক মুখরা রমণীর স্বামী এবং হাফ ডজন বখাটে পুত্র সন্তানের জনক।

রোগীর ব্যাপারে গোজি-র কোনো দরদ থাকার কথা নয়। পিপি গোজি এফ. বি. আই.-এর অফিসার, উইচিটা ব্যুরো-র ইনচার্জ। লোকটার চুল ছোটো, কিন্তু লোকে যা আন্দাজ করে তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। পিপি গোজির যদি কোনো দরদ না থাকে, মাইকেল এণ্ডারসনেরও থাকার কথা নয়। ছেলেমানুষই বলা যায় তাকে, পিপি গোজির সহকারী হিসেবে কাজ করছে। পঞ্চম লোকটার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি, উপস্থিত দু'একজন তার পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কেবিনের বাইরে সাদা পোশাক পরা দু'জন সিকিউরিটি অফিসার পাহারায় আছে, এই সাতজনের একটা তালিকাও আছে তাদের কাছে। নামগুলোর পাশে প্রত্যেকের পরিচয় লেখা আছে বটে, কিন্তু এই পঞ্চম ব্যক্তির নামের পাশে লেখা আছে দুটো মাত্র শব্দ—কর্নেল উড। কোথাকার কর্নেল সে-সম্পর্কে কোনো আভাস দেয়া হয়নি। কর্নেল উড এই মুহূর্তে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের

সাথে একটা রিপোর্ট পড়ছে। আর তার সহকারী, একজন নিগ্রো লেফটেন্যান্ট, রোগীর দিকে পিছন ফিরে টেপ-রেকর্ডার অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত। সপ্তম ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় দিয়েছে—সে নাকি টেলিফোন কোম্পানীর চীফ সিকিউরিটি অফিসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, নিউ ইয়র্কের মাইকেল টুইড।

বিছানায় পড়ে থাকা দুর্ভাগা লোকটার গলা থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। অথচ কেউ তার দিকে তাকালো না, সবারই দৃষ্টি ঝট্ করে উঠে গেল একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দিকে, যন্ত্রের স্ক্রীনে লোকটার হার্টবিট ধরা পড়ছে—চলমান সাদা বিন্দুর বিরতিহীন মিছিল।

সিনিয়র এফ. বি. আই. অফিসারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। পিপি গোজি চাপা, কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো, 'ওকে মরতে দেবেন না!'

মেজর-ডক্টর ডেরেক মারলো কাঁধ ঝাঁকালো। ভাবলো, বাপই বোধহয় ঠিক বলেছিল। সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেই ভালো হতো। পার্ক এভিনিউয়ে দু'কামরার একটা চেম্বার নিয়ে বসতো, কর্নেল আর ফেডারেল এজেন্টদের অন্যায় আবদার শুনতে হতো না। 'আমরা আমাদের সাধ্যমতো করছি,' শান্ত গলায় বললো সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা। রোগী বাঁচবে কিনা নিজেও জানে না, অথচ একই হুকুম বারবার শুনতে হচ্ছে।

'সাধ্যমতো করাই যথেষ্ট নয়,' বললো পিপি গোজি। 'একান্তই যদি মরতে চায়, আমরা ওর সাথে কথা বলার পর মরুক।' তার সহকারী মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করলো।

'কেমন বুঝছেন, মেজর?' প্রশ্নটা কর্নেলের।

'কি জানি। এখনো যে নিঃশ্বাস ফেলছে এটাই তো আশ্চর্য।

আপনারা তো আর গুলি করতে কোথাও বাকি রাখেননি।'

'শুনুন, মেজর···'

'ষাঁড়ের মতো জীবনীশক্তি,' বলে চলেছে ডাক্তার-মেজর। 'অন্য কোনো লোক হলে হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মারা যেতো।'

এই সময় বিছানা থেকে একটা শব্দ উচ্চারিত হলো, 'এডনা।' আওয়াজটা রোগীর গলা থেকে নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো।

সাতজনই ঝুঁকে পড়লো বিছানার দিকে। কিন্তু রোগী আর কোনো কথা বললো না।

'এডনা?' সবার দিকে একবার করে তাকালো পিপি গোজি, এফ. বি. আই. অফিসার। 'এডনা মানে?'

সেবিকা ভ্যানেসা মানুষটা ছোটোখাটো, মাত্র বাইশ বছর বয়স, কিন্তু ইউনিফর্ম পরেও সে তার যৌবন আড়াল করতে পারেনি। প্রশ্নটা নিয়ে দু'সেকেণ্ড চিন্তা করলো সে, তারপর বললো, 'কি জানি!'

'ওর স্ত্রী হতে পারে না,' টান টান পেশী নিয়ে বললো কর্নেল উড। 'সে মারা গেছে, তিন বছর আগে।'

'তার নাম ছিলো লিজা,' তিরস্কারের সুরে বললো এফ. বি. আই. অফিসার।

ওদের সবার মুখের দিকে তাকালো সেবিকা ভ্যানেসা।

'ওর বার্থ সার্টিফিকেট, হাইস্কুল ডিপ্লোমা, এবং নেভি থেকে পাওয়া ডিসচার্জ পেপার সবই জাল,' ভ্যানেসার কানের কাছে পুরু ঠোঁটে নামিয়ে ফিসফিস করে বললো নিগ্রো লেফটেন্যান্ট।

'এডনা,' গুরুতর আহত লোকটা আবার উচ্চারণ করলো। এই

লোকই টেলিফোনের সুইচিং সেন্টারটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

টেলি-বম খাতায় পুরো বাক্যটা এভাবে লেখা আছে, 'এডনা ব্যারেল বললো আপনি আপনার বাড়িটা বিক্রি করতে চান।' কথাটার অর্থ এবং তাৎপর্য কামরার মাত্র একজন লোক জানে, কিন্তু সে বেচারার এমন অবস্থা নেই যে সবাইকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে। অসিলোস্কোপের স্ক্রীনে সাদা বিন্দুগুলো আগের মতো ব্যস্তভাবে ছুটছে, রোগীর হার্টবিটের কোনো উন্নতি নেই।

'দুঃখিত, জেন্টলমেন,' শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললো ডাক্তার-মেজর ডেরেক মারলো। 'রোগীর অবস্থা ভালো নয়। আপনারা কিছু লোক এবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।'

'কেসটার সাথে হয়তো জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে,' প্রতিবাদের সুরে বললো পিপি গোজি।

'আমরাও থাকছি,' অধিকার ঘোষণার সুরে বললো কর্নেল উড।

'ডাক্তার, যেভাবে হোক লোকটাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন,' সিনিয়র এফ. বি. আই. অফিসার জেদ ধরলো। 'কথা ওর সাথে আমাদের বলতেই হবে। আমরা ধারণা করছি লোকটা জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত।'

'কিন্তু আমরা ওঁকে শুধু অসহায় একজন রোগী হিসেবে দেখবো,' হাসিমুখে বললো সেবিকা ভ্যানেসা। তার কথায় সরল মানুষের গুণই প্রকাশ পেলো, এ-ধরনের আপাতঃ নির্দোষ কথায় কেউ রাগ করতে পারে সে-ব্যাপারে সচেতন নয়। 'সেজন্যেই আমরা চাইবো আপনারা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

চোটপাট দেখাবার কোনো ইচ্ছেই কারো মধ্যে জাগলো না।

দরজার দিকে পা বাড়ালো এফ. বি. আই. অফিসার, তাকে অনুসরণ করলো কর্নেল। যদিও, দু'জনেই যে যার এইডের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। তারা নড়লচড়ল না। কালো লেফটেন্যান্ট বিছানার পাশে বসলো, হাতে টেপ রেকর্ডার। সে জানে, এফ. বি. আই. সহকারীর অ্যাটাচি কেসেও একটা টেপ-রেকর্ডার আছে। কিন্তু জিনিসটা লুকিয়ে রাখার কি মানে তা তার বোধগম্য নয়।

দশ মিনিট পর টেলিফোন কোম্পানীর লোকটা বললো, 'যাই, কিছু মুখে নিয়ে আসি।' সত্যি খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু তার নাম মাইকেল টুইডও নয়, নিউ ইয়র্কে সে বাস বা কাজও করে না। এমনকি আমেরিকান টেলিফোন অ্যাণ্ড টেলিগ্রাম কোম্পানীর কর্মচারীও নয় সে। এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে লোকটা, যেখানে ভুল করলে ক্ষমা করা হয় না। ওরা কখনো ক্ষতিপূরণ দেয় না, ক্ষতিটা ওদের দ্বারা হলেও।

ঠিক এই মুহূর্তে ওরা ইউ. এস. আর্মি হাসপাতাল ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের এগারো নম্বর কেবিনের রোগীকে নিয়ে কি করা যায় সে-ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করছে।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে উড়ে এলো গ্রেনেডটা, তীব্র আলোর ঝলকানির সাথে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। মারা গেল চারজন লোক। ঝোপের আড়াল থেকে ড্রাম পেটাবার মতো আওয়াজ করে উঠলো হেভি মেশিনগান, বুলেটের প্রথম ঝাঁক আরো পাঁচজনকে ধরাশায়ী করলো। পরমুহূর্তে কনভয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়লো গোটা চারেক গ্রেনেড, দুনিয়া কাঁপানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো ট্রাক ভর্তি অ্যামুনিশন। লাইনের প্রথম গাড়িটা একবার মাত্র ডিগবাজি

খেয়ে খাদে পড়ে গেল, পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের বুলেট ড্রাইভারের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সবই প্রায় বের করে নিয়ে গেছে। খাদের নিচে অদৃশ্য হবার আগে লকলকে জিভের মতো আগুনের শিখা দেখা গেল ফুয়েল ট্যাংকে। একটা হাফ-ট্রাকে দাঁড়িয়ে একজন মেশিনগানার পাল্টা গুলিবর্ষণ করছে বটে, কিন্তু রানা জানে একটু পর তাকেও পটল তুলতে হবে।

হলোও তাই। স্বল্প বাজেটের জাপানী ছবি সবগুলো প্রায় একই ধরনের, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের বীরত্ব খাটো করে দেখানো হয়। বেশুমার মারা পড়ে বেচারারা।

বেলা এগারোটায় চার দেয়ালের ভেতর বসে যুদ্ধের ছবি দেখার কোনো মানে হয় না। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা, টিভি সেট অফ করে একটা সিগারেট ধরালো। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি রেডিওটা অন করলো ও। খবর পড়া শুরু হয়ে গেছে।

আহত অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। এফ. বি. আই. হয়তো সতর্ক হয়ে গেছে। ওষুধের সাহায্যে লোকটার হয়তো জ্ঞান ফেরানো হয়েছে, তারপর নির্যাতন চালিয়ে কথা আদায় করা সম্ভব।

আরেকটা কথা ভুলে থাকতে পারছে না রানা। মস্কো কি একা শুধু তাকেই লোকটার চুক্তিপত্র বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে? কে. জি. বি. রেসিডেন্টকে কোনো নির্দেশ দেয়নি?

দিতে বাধ্য, না দিয়ে পারে না। কারণ তারা জানে, অনুরোধটা রানা না-ও রাখতে পারে।

তবে রানা এ-ব্যাপারে কিছু করে কিনা সেটা আগে দেখবে ওরা। যদি বোঝে রানা অন্য রকম প্ল্যান করছে বা কোনো প্ল্যানই করছে

না, তখন ওরা নিজেরা নাক গলাবে।

কাজেই বেশি সময় নেয়া যাবে না। প্ল্যানটা এখুনি করে ফেলতে হয়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটাও। দেরি হয়ে গেলে লোকটাকে বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু ঝুঁকিটা…!

ও-সব কথা ভেবে আর লাভ কি। চোখ-কান বন্ধ করে থাকা যদি সম্ভব হতো তাহলে আলাদা কথা ছিলো। বিবেকের দংশন সইতে না পারলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

খানিক পায়চারি করে আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা। মন্দ কি, খানিকটা উত্তেজনার স্বাদ তো অন্তত পাওয়া যাবে। আর যদি সফল হয় ও, উপরি পাওনা হিসেবে আসবে বিশেষ তৃপ্তি। কাউকে নতুন জীবন দান করার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে!

মোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা। একটা বুদ থেকে হোটেল স্যাভয়ে ফোন করলো। ম্যাট ইসটনের জন্যে একটা মেসেজ আছে —সমস্ত আয়োজন শেষ। মেসেজটা দেয়া হয়েছে দশটা চল্লিশে। তারমানে বারোটা চল্লিশে ফিফথ এভিনিউ ধরে হাঁটা শুরু করবে লিলি। খদ্দেররা তখন দলে দলে বাড়ির পথ ধরবে, আর অফিস কর্মচারীরা লাঞ্চের জন্যে বেরুবে, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিতে দু'-জনেরই সুবিধে।

ঠিক সময়ই লিলিকে দেখতে পেলো রানা। বারোটা ত্রিশ মিনিটে ফিফটি-সিক্সথ্ আর ফিফটি-সেভেনথ্-এর মাঝখানের একটা বুকস্টল থেকে দু'খানা বই বগলদাবা করে বেরিয়ে এলো লিলি। দোকানের প্রৌঢ় দারোয়ান তার সুগঠিত নিতম্বের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিললো, লক্ষ্য করে পিত্তি জ্বলে গেল রানার। তারপরই মনে মনে

হাসলো সে। ঈর্ষা, তাই না?

লিলি রাস্তা পেরুচ্ছে, দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একজন লোককে বুক-স্টলে ঢুকতে দেখলো রানা। রাস্তা পেরিয়ে রানার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে লিলি, রাস্তার মোড় থেকে বুকস্টলের দিকে তার-পরও তাকিয়ে থাকলো রানা।

লোকটা একটা খবরের কাগজ হাতে বেরিয়ে এলো বুকস্টল থেকে। রাস্তা পেরুচ্ছে।

ফেউ?

লোকটার পরনে বাদামী জ্যাকেট। পায়ে বাদামী জুতো। হ্যাটটা ব্রাউন। রানার চেয়ে দু'ইঞ্চি খাটো হতে পারে, তবে চওড়ায় বেশি হবে। মোটাতাজা শরীর, কিন্তু সবটাই চর্বি নয়। লিলি যেদিকে গেছে সেদিকেই হাঁটা ধরলো সে। তার পিছু নিলো রানা। চিন্তায় পড়ে গেছে ও।

রানাকে লিলি দেখতে না পেলেও পিছনে যে ফেউ লেগেছে তা সে জানে। দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েই কোণের হলমার্ক কার্ড শপে ঢুকে পড়লো সে। শুধু চিন্তিত নয়, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার। এরা যে রবিনকে খুন করতে চায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সে-চেষ্টা একবার তারা করেওছে। রবিন আর তাকে একসাথে খুন করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হবে। কিন্তু রবিনকে যদি না পায়, তাহলে কি করবে? তাহলে কি ওকে একাই মেরে রেখে যাবে?

এ-ও জানে লিলি, জায়গামতো রবিনকে পাওয়া যাবে না। তার সামনে আসার আগে চারদিকটা ভালো করে দেখে নেবে রবিন। ফেউটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে সে। আর ফেউ আছে বুঝতে পারলে লিলির সাথে রবিন দেখাই করবে না।

কিন্তু সে যে বিপদের মধ্যে পড়েছে তা তো রবিন বুঝবে। তার নিরাপত্তার জন্যে কিছুই কি করবে না সে ?

আরেকটা চিন্তা লিলির মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে। ফেউটা ওর খোঁজ পেলো কিভাবে ? লোকটা আমেরিকান কোনো ইণ্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিত্ব করছে না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। তারমানে আবার সেই গ্রু। কিন্তু ওরা তাকে ট্রেস করছে কিভাবে ? মাথার ভেতর সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ও কোথায় আছে তা যাদের জানার কথা, তাদের মধ্যে বেঈমান রয়েছে কেউ ?

হ্যাঁ, এ না হয়েই যায় না। এই একটাই সম্ভাবনা ! কিন্তু কে হতে পারে বেঈমানটা ? ওরকম একটা জায়গা বেঈমান থাকা কিভাবে সম্ভব ! তাহলে তো··· ! মনে মনে শিউরে উঠলো লিলি। আর কিছু ভাবতে পারছে না সে।

বেঈমানটা যাতে বেঈমানী করতে না পারে সে উপায় তার সাথেই আছে। কিন্তু এখন এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি ?

দোকানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লিলি দেখলো, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ফেউ, সিগারেট ধরাচ্ছে। আরো পাঁচ মিনিট দোকানের ভেতর ঘুরঘুর করলো সে, তারপর বেরিয়ে এলো। বারোটা উনচল্লিশ মিনিটে ফিফথ্ এভিনিউ পেরিয়ে পুব দিকে চলে এলো।

ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ফেউ খসাবার চেষ্টা করলো লিলি। বার কয়েক সরু গলিতে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে এলো মেইন রোডে। দু'বার মনে হলো, খসানো গেছে। কিন্তু তারপরই আবার দেখতে পেলো লোকটাকে। এরপর আর সরু গলিতে ঢুকতে সাহস পেলো না। গলিতে লোকজন কম,

আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। মনে মনে ঠিক করলো, নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোবে সে। যথাসময়ে রঁদেভো-তে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে। বাকিটুকু নির্ভর করুক রবিনের ওপর।

এয়ার ফ্রান্স অফিসে ঢুকলো লিলি, আগামী দু'দিনের ফ্লাইট শিডিউল কিনলো একটা, অকারণে। ক্যাথেড্রালটা দূর থেকে দেখা গেল। দু'মিনিট পর সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোলো সে, একটা পারফিউমের দোকানে ঢুকে নতুন একটা সেন্ট কিনলো। একটা পাঁচে ফিরে এসে সেন্ট প্যাট্রিক-এ ঢুকলো। আদর্শ একজন ক্যাথলিকের মতো এক হাঁটু ভাঁজ করে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করলো, যদিও আদর্শ নারী বা ক্যাথলিক কোনোটাই সে নয়।

একটা পনেরো মিনিটে ঝাঁঝালো রোদে আবার বেরিয়ে এলো লিলি। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কসরত করে এগোতে হলো। এক লোকের সাথে ধাক্কা লাগায় ঝাঁকি খেলো সে, বগলের নিচে থেকে পড়ে গেল বইগুলো। হাঁটু ভাঁজ করে উবু হলো, বইগুলো তোলার সময় চারদিকে তাকালো ভালো করে। ফেউ মনে হলো একজনই।

রোড লেভেল থেকে অনেকটা নিচে স্কেটিং রিঙ, চারপাশে রঙিন ছাতা মেলে গ্রীষ্মকালীন রেস্তোরাঁ চালু করা হয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে, ইচ্ছে হলো একটা ছাতার নিচে বসে ঠাণ্ডা কিছু খায়। কিন্তু না, নিজেকে স্থির টার্গেট বানানো উচিত হবে না। হাঁটতে হাঁটতে রকফেলার প্লাজা-কে পাশ কাটালো। আঠার মতো লেগে আছে ফেউ। এন. বি. সি. স্টুডিওর লবিতে ট্যুরিস্টদের ভিড়।

দক্ষিণের গেট দিয়ে আবার রাস্তায় বেরুলো লিলি। ফিফটি-নাইনথ্ স্ট্রীট। জুয়েলারীর দোকানগুলোকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিম

দিকে হাঁটছে। সেভেনথ এভিনিউয়ে সস্তাদরের অনেকগুলো হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফুটপাথে কলগার্লদের আড্ডাখানা। রেস্তোরাঁ-গুলোর সাইনবোর্ডে রঙচঙে অক্ষরে লেখা রয়েছে, টপলেস। মেট্রো-পোলে ঢুকলো লিলি। থ্রি-পীস ব্যাণ্ডে রক মিউজিক বাজছে। লম্বা বারে বসে আছে দশ-বারো জন লোক। ড্যান্সিং ফ্লোরে ছুটো মেয়ে নাচছে, দম দেয়া পুতুলের মতো যান্ত্রিক লাগলো। স্বর্ণকেশীর বয়স হবে বিশ, সোনালি বিকিনি প্যান্টি পরে আছে, সাথে ম্যাচ করা জুতো। আরেকজনের বয়স ছ'চার বছর বেশি হবে, নিগ্রো। ছ'জনেই অকারণে হাসছে, এবং টপলেস।

বারের কোথাও রানাকে দেখলো না লিলি

লিলিকে নয়, ফেউটাকে অনুসরণ করছে রানা। লিলির ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে ও। ভেবেছিল, কোনো না কোনো ভাবে ফেউটাকে লিলি খসাতে পারবে, কিন্তু ওর আশা পূরণ হয়নি। লিলি অবশ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন দক্ষতার সাথে নয়।

লিলি মেট্রোপোলে ঢোকার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রানা। যা করার ওকেই করতে হবে।

মেট্রোপোলের সামনে তেকোণা আকৃতির ক্ষুদে একটা রেলিং ঘেরা পার্ক, রেলিঙে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা। পার্ক না বলে আইল্যাণ্ড বলাই ভালো, রাস্তা পেরোবার জন্যে বহু লোক ওটার ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রানা, জ্যাকেটের বোতাম আগেই খুলে ফেলেছে। আইল্যাণ্ড আর ছ'পাশের ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, বিভিন্নমুখী স্রোতের মতো মিছিল করে ছুটে চলেছে মানুষ। এখানে গোলাগুলি হলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে। একেবারে বাধ্য না

হলে পিস্তল বের করার ইচ্ছে নেই রানার।

শান্তভাবে রেলিঙের দিকে এগোলো ও।

রেলিঙে হেলান দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেট্রোপোলের দরজার দিকে।

তার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট রয়েছে, কিন্তু এখনো ধরায়নি। আরো একটা সিগারেট রয়েছে হাতে। লোকটার কাঁধে মৃদু টোকা দিলো রানা।

অদ্ভুত কাণ্ড! লোকটা ওর দিকে তাকালোই না। বললো, 'হ্যাঁ কি ব্যাপার?'

'সিগারেট।' হাত লম্বা করে দিয়ে লোকটার মুখের সামনে সিগারেটটা ধরলো রানা।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটার পেশী। ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালো সে। কঠিন একটা অবয়ব দেখলো সে। অপরিচিত।

'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' চাপা গলায় বললো রানা। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু গর্বের রেশ নিজের কানেও ধরা পড়লো।

'কি চাই?' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো লোকটা, কথার সুরে বিদেশী টান স্পষ্ট।

'তোমার সঙ্গ,' বললো রানা। লোকটার ঠোঁটের সামনে সিগারেট ধরলো ও। 'এটা ধরিয়ে আমার আগে আগে হাঁটো।' জ্যাকেট একটু ফাঁক করে ভেতরের পিস্তলটা দেখালো তাকে। 'কোনো রকম চালাকি করলে বিপদে পড়বে।'

ঠিক এই সময় মেট্রোপোল থেকে বেরিয়ে এলো লিলি।

'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' রানার কথাটাই পুনরাবৃত্তি

করলো লোকটা, অনেকটা যেন ক্ষোভের সাথে।

সেই মুহূর্তে রানার চোখের কোণে ধরা পড়লো, হাতের বইগুলো ওদের মাথার দিকে ছুঁড়ে মারছে লিলি। কি বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করলো রানার। ঝট করে নিচু হলো ও, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি হলো।

দুটো আওয়াজ—পিস্তলের ঢব্, আর অস্ফুট গোঙানি।

নিচু হয়েই বিদ্যুৎবেগে একপাশে ডাইভ দিলো রানা। পিছন থেকে আরেকটা গুলি হলো প্রথম ফেউটার কি অবস্থা হয়েছে দেখার সময় নেই, ডাইভ দিয়ে ঘাসের ওপর পড়েই কোমর থেকে পিস্তল বের করে পিছন দিকে তাকালো ও। আইল্যাণ্ডের উল্টো-দিকের রেলিং টপকে পালাচ্ছে দ্বিতীয় ফেউ। ট্রিগার টিপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো রানা। লোকজন ছুটোছুটি করছে, কার না কার গায়ে লাগবে।

উদভ্রান্তের মতো রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেল লিলি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। অকস্মাৎ ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠলো চারদিক থেকে। দুটো গাড়ির মাঝখানে দুই ফিটের মতো ফাঁক, সেই ফাঁকে পাথুরে স্যাণ্ড-উইচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে রেলিং টপকালো রানা, ফুটপাথে নামার আগে প্রথম ফেউটাকে দেখতে পেলো। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বাম বুকে রক্তাক্ত ফুটো নিয়ে।

হর্নের বিকট আওয়াজ, হৈ-চৈ, ছুটোছুটি—সব অগ্রাহ্য করে লিলির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুটলো। অস্পষ্টভাবে কানে এলো সাইরেনের ওঁয়া-ওঁয়া আও-য়াজ। ফুটপাথে না উঠে রাস্তার কিনারা ধরে ছুটছে ওরা। ভিড়ের

মধ্যে সবাই সাহসী নয়, কেউ কেউ সাহসী—ওরা পালাচ্ছে ধরে নিয়ে তাদের দু'একজন পথরোধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পিস্তল বের করার ভঙ্গি করে তাদের হটিয়ে দিলো রানা। পাঁচ মিনিট পর অকুস্থল থেকে অনেকটা দূরে সরে এলো ওরা, কেউ ও:দের পিছু নেয়নি। রানাকে প্রায় শান্তই বলা যায়, কিন্তু লিলি হাঁপাচ্ছে। খালি একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুললো রানা।

ছোটোখাটো এক ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলো ওরা। ট্যাক্সি করে বিশ মাইল পেরোবার সময় কেউ কোনো কথা বলেনি। কেবিনে কফি দিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটার, সিগারেট ধরিয়ে রানা বললো, 'তোমাকে বই ছুঁড়তে না দেখলে আমি ঝুঁকতাম না।' লিলি ফেউ-টাকে খসাতে পারেনি, সেজন্যে তাকে তিরস্কার করার ইচ্ছে রানার নেই। সে নিজে আরো মারাত্মক ভুল করেছে। প্রথম লোকটাকে যে দ্বিতীয় কোনো লোক কাভার দিতে পারে, এ-কথা একবারও তার মনে হয়নি। অথচ মনে হওয়া উচিত ছিলো। ভুল শুধু এখানেই নয়, আরো দু'জায়গায় করেছে রানা। কাঁধে ওর স্পর্শ পেয়ে লোকটা ঘাড় ফেরায়নি, কারণটা সাথে সাথে বুঝতে পারা উচিত ছিলো ওর। লোকটা রানাকে তার সঙ্গী বলে মনে করেছিল। তৃতীয় ভুলটা করার সাথে সাথে রানা যদি সেটা ধরতেও পারতো, লিলি বই ছোঁড়ার পর ও যা করেছে তার বেশি কিছু করতে পারতো না। 'পিছ-নেও একটা চোখ রাখতে হয়,' রানার এই কথাটা পুনরাবৃত্তি করে লোকটা আসলে তাকে বিদ্রূপ করেছে, শোনা মাত্র অন্তর্নিহিত অর্থটা রানার বুঝে নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বুঝতে পারেনি। 'দুটো বই, তাই না? কি নিয়ে লেখা?'

জোর করে একটু হাসলো লিলি। 'জেনে কাজ কি। বোঝা গেল, বইয়ের সাহায্য নেয়া আমাদের কপালে নেই।'

'আহা, বলোই না…।'

'রন্ধন প্রণালী শিক্ষা, আর ঘর সাজাবার দশটি উপায়,' ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বললো লিলি। 'সন্তুষ্ট?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

কফি শেষ করে সরাসরি রানার দিকে তাকালো লিলি, থমথম করছে চেহারা। 'তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?'

'বুঝতেই পারছি কি ঘটেছে,' শান্তভাবে বললো রানা। আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করছে না, কারণ সঠিক উত্তর লিলিরও বোধহয় জানা নেই। 'চিঠি দিয়ে আসার সময় বা টাকা সংগ্রহের সময় ওদের চোখে ধরা পড়ে যাও তুমি, সেই থেকে ওরা তোমাকে ফলো করছিলো।'

'ওরা…?'

'সম্ভবত গ্রু।'

'তারমানে আবারো সেই কথা বলতে চাইছো, রেসিডেন্টের দলে গ্রু-র চর আছে?'

'কিংবা স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট,' বললো রানা।

ম্লান চেহারা নিয়ে বসে থাকলো লিলি।

অন্য প্রসঙ্গ তুললো রানা। 'আমরা উইচিটা যাচ্ছি।'

ঝট্ করে মুখ তুললো লিলি, চোখে প্রশ্ন।

'মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে,' বললো রানা, আর কিছু ব্যাখ্যা করলো না।

বাধ্য মেয়ের মতো লিলিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বললো,

'টাকাগুলো এনেছি।' হাতব্যাগ খুলে ভেতর থেকে কয়েকটা বাণ্ডিল বের করলো সে।

টাকাগুলো গুণলো রানা। 'কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

মাথা নাড়লো লিলি

'তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি?'

'হয়েছে। তবে আমি কোনো উত্তর রেখে আসিনি।'

টেবিলের ওপর লিলির হাতে হাত রাখলো রানা, মৃদু একটু চাপ দিলো। 'চলো, মোটেলে ফিরি।'

টেবিলের ওপর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকলো লিলি। 'আমাকে একটা চুমো খাও।'

দু'মিনিট পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলো ওরা। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকলো সিটে। মোটেলে ফিরে আবার লিলিকে আলিঙ্গন করলো রানা। 'ধন্যবাদ, লিলি। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কি ব্যাপার?' আকাশ থেকে পড়লো লিলি। 'হঠাৎ?'

'দেখছো না এখনো আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছি!'

'ও, এই কথা!' লিলির চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'কিন্তু শুধু ধন্যবাদে আমি সন্তুষ্ট নই। সত্যি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাও, আরো সলিড কিছু দিতে হবে আমাকে।'

'আমি প্রস্তুত। বলো কি চাও?'

'কি চাই সেটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।' দু'হাত দিয়ে রানার বুকে মৃদু ধাক্কা দিলো লিলি। তারপর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লো নরম বিছানায়।

ঋণ শোধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রানা।

তেরো

চিত্ত হরণ করে এমন অনেক কিছুই দেখার আছে উইচিটায়। মিস্টার আর মিসেস রবিনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সময়ের অভাবে কিছুই তাদের দেখা হলো না। টি. ডব্লিউ. এ. জেট উইচিটা এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার আধ ঘণ্টা পর কে. জি. বি. টিম ভাড়া করা একটা গাড়িতে চেপে লিভেনওয়ার্থের দিকে রওনা হয়ে গেল।

উত্তর-পুব দিকে ছুটলো গাড়ি। পথে তেমন কিছু ঘটলো না। যাত্রাটা একঘেয়ে বলা যেতে পারে। জানালা খোলা বলে কেউ ঘামছে না, তবে আগুনের হলকার মতো গরম বাতাসে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া।

উইচিটা থেকে আশি মাইল দূরে এসে লিলি জানতে চাইলো, 'প্লেনে আমরা টোপেকা পর্যন্ত গেলেই পারতাম।'

রেডিও অন করে প্রিয় কোনো গান হচ্ছে কিনা দেখলো রানা।

'লিভেনওয়ার্থের অনেক কাছে হতো টোপেকা,' আবার বললো লিলি।

'নিউ ইয়র্ক থেকে ডাইরেক্ট এয়ার সার্ভিস নেই,' রেডিও বন্ধ করে ব্যাখ্যা করলো রানা। 'আর তাছাড়া, কেন যেন মনে হলো, পশ্চিম দিক থেকে ঢুকলে একটু বেশি নিরাপদ থাকবো।'

'আবার তুমি বিপদের আশংকা করছো?'

'জিজ্ঞেস করো, কোন সময়টায় করছি না!'

গম্ভীর হয়ে গেল লিলি। তার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিলো রানা। 'বিপদ আসে আসুক, সাধ্য মতো সতর্ক আছি আমরা। আর এই মুহূর্তে অজানা বিপদের কথা ভাবছিও না আমি।'

'মানে?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল লিলির, তারপর আবার সিটে হেলান দিলো সে। 'দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার আমার নেই।'

'তোমাকে তো বলেছি, মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে। আর দেখতেই পাচ্ছো কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা। তারপরও বুঝতে পারছো না বিপদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি?'

'দুঃখিত,' বলে রানার উরুতে একটা হাত রাখলো লিলি। 'জানি, তোমার মানসিক অবস্থা ভালো নয়। মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া—কি যে যন্ত্রণাকর, বুঝি।'

'খেয়ে নেয়া যাক, কি বলো?' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল রানা।

একটা রোডসাইড ডাইনারে থামলো ওরা, টয়লেট ব্যবহার করার সুবিধে আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো লিভেন-ওয়ার্থের মুডি হোটেলে। চুরাশিটা কামরা নিয়ে পাঁচতালা হোটেল, ম্যানেজার একজন প্রাক্তন কর্নেল, যুক্তিসঙ্গত ভাড়া। বিছানার চাদর পরিষ্কার পেলো ওরা, এয়ারকণ্ডিশনিং ঠিকমতো কাজ করে।

ডাবল রুমের ভাড়া পঁচিশ ডলার, ইউরোপিয়ান স্টাইলে সাজানো। বিছানার ওপর ভাঁজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল—আজকের লিভেনওয়ার্থ টাইমস। স্যুটকেস খুলে জিনিস-পত্র বের করতে শুরু করলো ওরা।

'হোম, হোম অন দি রেঞ্জ,' ওয়ারড্রোবে ব্লেজার ঝোলাবার সময় মৃদু গলায় গেয়ে উঠলো রানা।

'দ্যাটস দ্য স্টেটস সং,' মন্তব্য করলো লিলি।

'আর জাতীয় ফুল?'

'সানফ্লাওয়ার। জাতীয় পাখি?'

'ওয়েস্টার্ন মেডো লার্ক।'

'তোমাকে নিয়ে কে. জি. বি.-র গর্ব করা উচিত, রবিন,' বললো লিলি। 'হোম ওয়ার্কে একটুও ফাঁকি দাওনি।'

'কিন্তু,' অসহায় ভঙ্গিতে বললো রানা, 'ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। সাহায্য করতে পারবে?'

মাথা নাড়লো লিলি। 'শুধু এইটুকু বলতে পারি, পা ফেলতে একটু ভুল করলেই তুমি জানতে পারবে ওরা তোমার জন্যে ওখানকার মর্গে আগে থেকেই জায়গা খালি রেখেছে।'

'বলো, আমাদের জন্যে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার। যদি দেখি নিরাপদে বেরিয়ে আসার শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা আছে তবেই তোমাকে সাথে নেবো।'

'তা না হলে তুমি একা যাবে?' কাপড় পাল্টাচ্ছিল লিলি, হাত দুটো ব্লাউজের বোতামের কাছে স্থির হয়ে গেল। 'ও-সব চিন্তা বাদ দাও। তোমাকে আমি একা যেতে দেবো না।'

'ঠিক আছে, দিয়ো না। কিন্তু এখন দয়া করে ঘর থেকে বোতাম-

গুলোকে বেরুতে দাও।'

চট করে আধ খোলা ব্লাউজের দিকে একবার তাকালো লিলি। লজ্জা পেয়ে রানার দিকে পিছন ফিরলো। 'চোখের শরম বলতে কি কিছুই নেই ?'

অন্ধকার ঘরে বিছানায় পাশাপাশি শুলো ওরা, গায়ে চাদর।

'আমার প্ল্যানটার কথা তোমাকে বলেছি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তোমার যে একটা প্ল্যান আছে তাই তো আমার জানা ছিলো না।'

'হানি, প্ল্যানের কোনো অভাব নেই আমার। সমস্যা হলো বাছাই করা।' প্ল্যানটা কি, তা কিন্তু রানা ব্যাখ্যা করলো না।

'সিদ্ধান্ত তাহলে পাল্টাচ্ছো না ?' জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'লোকটাকে না মেরে···।'

'যায়, পারা যায়।'

'তুমি কি তাহলে··· ?'

'হ্যাঁ, ওখান থেকে ওকে বের করে আনতে চাই।'

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো লিলি, 'কিন্তু কিভাবে ?'

'কাল বলতে পারবো।' এখানেই আলোচনার ইতি টানলো রানা।

পরদিন সকালে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স নিয়ে একা বেরিয়ে গেল ও। সন্ধ্যা ছটায় ফিরলো, বগলের তলায় তখনো কার্ডবোর্ডের বাক্সটা রয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে একই রকম দুটো বাক্স নিয়ে এসেছে ও।

'আজেবাজে কতো কি ভাবছিলাম,' অভিযোগ করলো লিলি,

'দুশ্চিন্তায় আমার মাথা ধরে গেছে।'

তার কাঁধ চাপড়ে দিলো রানা। 'প্ল্যানটা ফাইনাল করে ফেলেছি। তোমারও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে।' ইশারায় কার্ডবোর্ড বাক্সটা দেখালো ও। 'নিউ ইয়র্কের একটা কস্টিউম আউট-ফিট থেকে ইউনিফর্মটা কিনেছিলাম, লেফটেন্যান্টের। কাজে লেগে গেল।'

'কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সারাটা দিন ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে কাটিয়েছি,' বললো রানা। 'কিভাবে ভেতরে ঢুকেছি শুনবে? ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে যাবার পথে দেখলাম রাস্তার ধারে একটা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে লেখা—লিভেনওয়ার্থ আর্মি হসপিটাল, স্টাফ বাস। ট্যাক্সি একটু দূরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম, বুক ফুলিয়ে উঠে বসলাম বাসে।'

তিন সেকেণ্ড ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো লিলি, যেন রানার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তারপর? গেটে কেউ তোমাকে আটকালো না? পাস দেখতে চাইলো না?'

বিরক্ত হলো রানা। 'কেন আটকাবে না! পাস দেখাতেই ছেড়ে দিলো, সবার সাথে ভেতরে ঢুকে গেলাম।'

'পাস তুমি পেলে কোথায়?'

'ধরে নাও কুড়িয়ে পেয়েছি,' মুচকি হেসে বললো রানা। ওকে সাহায্য করেছে ভিনসেন্ট গগল, কিন্তু তার পরিচয় লিলির কাছে গোপন রাখতে চায় রানা।

চেহারায় আহত একটা ভাব নিয়ে চুপ করে থাকলো লিলি।

'ভেতরে ঢুকে কি দেখলাম শোনো,' উৎসাহের সাথে আবার শুরু করলো রানা। 'তার আগে গেটের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করি। ভারি

কড়াকড়ি, বুঝলে। একটা পিঁপড়ে গলার উপায় নেই। কিন্তু জানোই তো, মিলিটারীদের আপার চেম্বার বেশিরভাগ খালিই থাকে। কুকুরের প্রভুভক্তির সাথে ওদের প্রভুভক্তির আশ্চর্য মিল। ভেবো না সৈনিকদের দুর্নাম করছি। তা আমি করতে পারি না, কারণ সেনাবাহিনীতে আমিও ছিলাম।' রানা জানে, তথ্যটা মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করছে লিলি। 'যা বলছিলাম। গেটে ওরা যারা রয়েছে, নিজেদের মাথা একদম খাটাতে পারে না। অনেকটা যন্ত্রের মতো, চাবি দিলে ঘোরে। আধ ঘণ্টা লাগলো সবার পাস চেক করতে, এই আধ ঘণ্টায় কম করেও বিশ বার টেলিফোন করলো ওরা। কারো পাস রিনিউ করা হয়নি, কারো পাসের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বলছে সাথে পাস আনতে ভুলে গেছে কিন্তু গার্ডরা তো তাকে চেনেই, এ ধরনের একটা সমস্যাও ওরা নিজেরা সমাধান করতে পারলো না। সংশ্লিষ্ট কর্তাকে টেলিফোন করে তারপর সিদ্ধান্ত নিলো।'

'খারাপ কি? ওরা বরং একটু বেশি সতর্ক।'

'আর ওদের এই সতর্কতা লক্ষ্য করেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো,' বললো রানা। বিছানার তলায় তাকালো ও। দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডের বাক্সটা রয়েছে ওখানে। 'ওটায় তোমার জন্যে একটা ইউনিফর্ম আছে। নার্সের ভূমিকা নিচ্ছো তুমি।'

'কি করতে হবে আমাকে?'

'এখনই শুনতে চেয়ো না,' কাপড় ছাড়তে শুরু করে বললো রানা। 'সময় মতো বলবো। আর কি দেখলাম শোনো।' বিছানায় বসে সিগারেট ধরালো রানা।

'কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'তিনতলায়।' রানা গম্ভীর। 'করিডরের মাথায় দু'জন মিলিটারী পুলিশ। দুশো এগারো নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে তাকে। কেবিনের বাইরে একজন মিলিটারী পুলিশ, আর সাদা কাপড়ে দু'জন এফ. বি. আই. এজেন্ট—আমার ধারণা ওরা এফ. বি. আই. ; সি. আই. এ. হলে গেছি।' চিন্তিত দেখালো রানাকে।

'সি. আই. এ. হলে অসুবিধে কি ?'

'ওরা যদি এফ. বি. আই. হয় তাহলে মনে করতে হবে লোকটাকে ওরা পাগল-ছাগল বা কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য বলে ধরে নিয়েছে। আর যদি সি. আই. এ. হয়, তাহলে মনে করতে হবে আসল বিপদ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে ওরা।' ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে ঝুঁকলো রানা, জুতো-মোজা খুলতে শুরু করলো। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও।

রেফ্রিজারেটর থেকে বিয়ারের দুটো ক্যান বের করলো লিলি। একটা নিয়ে ট্রাক ড্রাইভারদের মতো ক্যান থেকে গলায় ঢাললো রানা। 'ধন্যবাদ, ডারলিং।'

'ওরা সম্ভবত এফ. বি. আই.-ই, রবিন।'

'হলে তো ভালোই,' বললো রানা। 'কেবিনের ভেতরও ঢুকে পড়েছিলাম, বুঝলে। সকল প্রশংসা ইউনিফর্মের। অবশ্য সাত সেকেণ্ডের বেশি ভেতরে থাকতে পারিনি। সব কিছু দেখে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়, কি বলো ?'

'কি কি দেখলে ?'

'অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট, ডীপ ফ্রিজ, চাকা লাগানো ট্রে-তে গাদা গাদা ওষুধের বাক্স, ছয়জন লোক, একজন নার্স—তোমার চেয়ে সুন্দরী নয়।'

‘আমি রোগীর কথা জানতে চাইছি।’

‘চোখ বন্ধ, হুঁশ নেই বেচারার—যখন তখন অবস্থা।’

‘প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে?’ রানার পাশে বিছানায় বসলো লিলি।

‘যদি প্রয়োজন বোধ করি।’

‘সব দেখে তোমার মনে হয়েছে, লোকটাকে বের করে আনা সম্ভব?’

‘সম্ভব।’

‘আজ রাতে?’

মাথা নাড়লো রানা। ‘রাতেই তো বিপদের আশংকায় থাকবে। কালও নয়, কিছু কাজ এখনো বাকি আছে। পরশু কিংবা তার পর দিন—দিনে-দুপুরে। করিডরে অনেক লোকজন আসা-যাওয়া করবে। আজ লাঞ্চের সময় দেখলাম, কেবিন থেকে প্রায় সবাই বেরিয়ে এলো।’

‘কিন্তু আমার তো মাথায় ঢুকছে না, জ্বলজ্যান্ত একটা মানুষকে কিভাবে তুমি ওখান থেকে বের করে আনবে! এমন ভাব দেখাচ্ছো, যেন ছেলের হাতের মোয়া। আমার তো মনে হচ্ছে তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছো!’ বিছানা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো সে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ লিলির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। তারপর হেসে ফেলে বললো, ‘আচ্ছা, সত্যি যদি তাই হয়? যদি জানো আজ রাতটাই আমার জীবনের শেষ রাত? কি করবে তুমি, লিলি?’

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো লিলি। ‘এ-ধরনের একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো কিভাবে!’

‘শালার কথা আর বলো না, সে-ই তো এ-সব শিখিয়েছে আমাকে।’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো লিলি। ‘প্রলাপ বকছো নাকি?’

‘আরে না!’ হাসলো রানা। ‘মাসুদ রানার নাম শুনেছো? শালা আমার বন্ধু। ব্যাটাকে দেখেছি, বিপদে নাক গলাবার আগে মহা ফুর্তিতে মেতে থাকে—নামকরা হোটেলে গিয়ে দামী ডিনার খায়, সুন্দরী মেয়ের সাথে নাচে, তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে আসে ঠিক তোমার মতো একটা লাল টুকটুকে…।’

লিলি কি যেন একটা ছুঁড়ে মারছে দেখে থেমে গেল রানা, ঝট্ করে এক পাশে সরিয়ে দিলো মাথাটা। দেয়ালে লেগে বিছানায় পড়লো খালি বিয়ারের ক্যান।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ‘নারী চরিত্র বড়ই রহস্যময়। কেউ বিশ্বাস করবে বই ছুঁড়ে কাল তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো?’

আকস্মাৎ ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো লিলি। ‘তোমার কোনো কথাই আমি শুনবো না। প্ল্যানটা আজ রাতেই আমাকে বলতে হবে। রবিন, প্লিজ।’

লিলিকে দু'হাতে ধরে বিছানায় বসালো রানা। ‘ঠিক আছে, আজ রাতেই। কিন্তু কথা দাও যতোটুকু বলবো তার বেশি জানতে চাইবে না। যেটুকু বলবো না সেটুকু তোমার জানার দরকার নেই বলেই বলবো না।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে লিলি বললো, ‘বেশ, চাইবো না। কিন্তু প্ল্যানটায় যদি কোনো খুঁত দেখি, সংশোধনী আনতে পারবো তো?’

‘তা পারবে।’

‘এখন তাহলে আমরা কি করবো?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘ফুর্তি,’ বলে বিছানা ছাড়লো রানা। ‘শাওয়ার সেরে ডিনার খেতে যাবো—কোথায় জানো? হিলটনে। তারপর নাচবো ড্রিমল্যাণ্ডে। সবশেষে···।’

‘থাক, থাক—সব যদি বলেই ফেলো তাহলে আর থাকলো কি!’

দু’দিন পর সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হলো অপারেশন।

নার্সের ইউনিফর্ম পরে নির্দিষ্ট একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলো লিলি। তার আগে আরো তিনজন পৌঁচেছে ওখানে—একজন ডক্টর-কর্নেল, একজন মেজর, অপরজন লেফটেন্যাণ্ট-নার্স। সাথে রানার দেয়া কাগজ-পত্র থাকলেও, লেফটেন্যাণ্ট-নার্সকে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো লিলি। মেয়েলি কৌতূহল কি জিনিস তার জানা আছে, বাস আসতে দেরি হলে নির্ঘাৎ গল্প জমাবার চেষ্টা করবে মেয়েটা। আগে তোমাকে দেখিনি কেন, কোন্ ডিপার্টমেণ্টে আছো, কোন্ ডাক্তারের আণ্ডারে ডিউটি কারো—এ-সব প্রশ্নের কি উত্তর হবে তা তার জানা আছে, কিন্তু যদি না মেলে? দেখতে দেখতে দু’একজন করে আরো দশ-বারোজন স্টাফ এসে পৌঁছুলো।

লিলির ভাগ্য ভালো লেফটেন্যাণ্ট-নার্স ওর সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর দিকে ভালো করে তাকালো না পর্যন্ত। তার মনের অবস্থা লিলি যদি জানতে পারে, নির্ঘাৎ জ্ঞান হারাবে।

লেফটেন্যাণ্ট-নার্সের বদলে মেজর লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠলো। পাশে সরে এসে হাসলো সে, সকাল বেলার স্নিগ্ধ

আবহাওয়ার প্রশংসা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালো। তবে লিলি ঘামতে শুরু করার আগেই স্টাফ বাস এসে পড়লো, মেজরের পিছনে লাইন দিলো সে। বাসে উঠে প্রথমে দেখে নিলো মেজর কোথায় বসেছে, তারপর তার কাছ থেকে দূরে একটা সিটে বসলো। লেফটেন্যান্ট নার্স বসেছে সবার পিছনে।

হাসপাতালের গেটে স্টাফ বাস থামলো না, থামলো উঠনের এক প্রান্তে। কিন্তু আরোহীরা নামার সময় সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের সবার পাস এবং আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করলো। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় সম্পূর্ণ শান্ত থাকলো লিলি। রবিনের ওপর আস্থা আছে তার, জানে পাস আর আইডেনটিটি কার্ড যেখান থেকেই যোগাড় করে থাকুক, ওগুলোয় কোনো খুঁত নেই।

লেফটেন্যান্ট-নার্সের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে লিলি।

'আপনাকে একটু গেট-হাউসে অপেক্ষা করতে হবে, ম্যাডাম,' লেফটেন্যান্টকে বললো একজন গার্ড।

'সেকি! কেন?' যেন আকাশ থেকে পড়লো নার্স মেয়েটা।

'আপনার আইডেনটিটি কার্ড ঠিক আছে, কিন্তু গেট পাসের মেয়াদ পার হয়ে গেছে কাল…।'

গার্ডদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সার্জেন্ট, তার দিকে তাকিয়ে লিলি বললো, 'জানেনই তো আমরা কি রকম ব্যস্ত থাকি। এ-ধরনের সামান্য ভুল-ভালের জন্যে আপনারা যদি…।'

লিলির কথা শেষ হলো না, দাঁত বের করে হাসলো সার্জেন্ট। 'ও, আপনার গেট পাসের মেয়াদও বুঝি পার হয়ে গেছে?'

ব্যস্তভাবে নিজের গেট পাসের ভাঁজ খুলে দেখলো লিলি। হেসে উঠলো সে। 'উঁহুঁ, আরো দু'দিন বাকি আছে, সার্জেন্ট।'

'ঠিক আছে, লেফটেন্যান্টকে যেতে দাও,' গার্ডদের হুকুম করলো সার্জেন্ট, তারপর লেফটেন্যান্টের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললো, 'কাল যেন সাথে নতুন পাস থাকে।'

এরপর লিলির পালা। কাগজগুলো গার্ডের হাতে দিয়ে লেফটে-ন্যান্ট-নার্সের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো সে। কেমন মেয়ে রে বাবা! ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলো না!

কাগজগুলো লিলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাত-ইশারায় তাকে সামনে এগোতে বললো গার্ড।

হাসপাতাল ভবনে ঢুকে বেশ স্বচ্ছন্দে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো লিলি। কাল রাতে রানা তাকে বিল্ডিংটার লে-আউট দেখি-য়েছে, মনে গাঁথা আছে সব, কাজেই বিপজ্জনক এলাকাগুলো এড়িয়ে থাকা কঠিন হলো না। কিন্তু সমস্যা হলো সময় কাটানো নিয়ে। কোথাও বসে থাকা চলবে না, তাহলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আবার একই করিডর ধরে বারবার আসা-যাওয়া করাও ঠিক হবে না। অথচ বেলা দেড়টার আগে ওর কোনো কাজ নেই।

পুরো হাসপাতালটা, প্রথম থেকে চার তালা পর্যন্ত, একবার ঘুরে এলো লিলি। একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগলো। সেই মেয়েটা, লেফটেন্যান্ট নার্স, তারও কি কোনো কাজ নেই? একবার দোতা-লায়, আরেকবার চারতালায় সামনাসামনি হলো ওরা। ওকে দেখে কেমন যেন বিব্রত বোধ করলো মেয়েটা, তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আবার নিচতালায় নেমে এলো লিলি। সময়ের আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের দিকে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাকে। তবু আবার একবার তিনতালায় উঠলো সে। করিডরের মাথায় দু'জন মিলিটারী পুলিশ কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরো একজন মিলিটারী পুলিশ, আর দু'জন সাদা পোশাক পরা সিকিউরিটি অফিসার। রবিনের সন্দেহ ওরা এফ. বি. আই. এজেন্ট না-ও হতে পারে।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ত্রস্ত পায়ে করিডর পেরিয়ে আরেক সিঁড়ির দিকে এগোলো সে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে টয়লেটে ঢুকলো লিলি। কিন্তু টয়লেটে আর কতোক্ষণ বসে থাকা যায়। দশটা দশে করিডরে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে এগোলো। তিনটে ধাপ টপকে নেমে এলো বাগানে।

এই সময় বাগানে কারো থাকার কথা নয়। কাউকে দেখলোও না লিলি। ফুল গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। কোথাও বসলো না, কে জানে ওপরতালার কোনো জানালা দিয়ে কেউ হয়তো লক্ষ্য করছে ওকে। মস্ত বড় একটা গোলাপ দেখে থমকে দাঁড়ালো সে, হাত বাড়ালো ফুলটা ছেঁড়ার জন্যে। কিন্তু কি মনে করে হাতটা ফিরিয়ে নিলো আবার। থাক।

ওখান থেকে সরে এলো লিলি।

'ম্যাডাম ?' পিছন থেকে ভারি একটা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো লিলি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, বাসের সেই মেজর। মস্ত লাল গোলাপটা গাছ থেকে ছিঁড়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। মিটি মিটি হাসছে লোকটা।

'আমাকে কিছু বলছেন, মেজর ?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'দেখলাম ফুলটা আপনি ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়লেন না,' মেজর বললো।

'তাতে আর লাভ হলো কই, একজন তো ছিঁড়লোই।'

'ছিঁড়লাম কারণ সে অধিকার আমার আছে,' হাসিমুখে বললো মেজর। 'চলতি মাসে বাগানের সিকিউরিটি আমার কাঁধে।'

'ও।'

'নিন না, নিন,' বাড়ানো হাত সহ এক পা এগিয়ে এলো মেজর।' 'আপনি যে ফুল ভালোবাসেন সে তো বোঝাই গেছে। তা না হলে কাজের মাঝখানে সময় করে বাগানে ঢুকবেন কেন! নিন, ফুলটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি আমি।'

গোলাপটা নিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো লিলি। 'ধন্যবাদ।'

লিলির গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো মেজর।

বেলা ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে গেট বি-র সামনে এসে ব্রেক করলো ডেলিভারি ভ্যানটা। ড্রাইভার, একজন প্রৌঢ় ইটালিয়ান, লাফ দিয়ে নামলো নিচে। সাথে সাথে চার-পাঁচজন সশস্ত্র গার্ড তাকে ঘিরে ফেললো।

গেট হাউসের ভেতর থেকে ডিউটি অফিসারও ভ্যানটাকে দেখতে পেলো। খোলা নোটবুকটা তার সামনেই রয়েছে, লেখাগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলালো সে। কর্নেল ওয়াটসন সকাল দশ-টাতেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন একটা ডীপ ফ্রিজ নিয়ে সরকারী মেডিকেল স্টোর থেকে ডেলিভারি ভ্যান আসবে। ফ্রিজটা ভেতরে আনার জন্যে লোক লাগবে, ভ্যানের সাথেই আসবে তারা। পাস চাওয়ার দরকার নেই, সবাইকে যেন ঢুকতে দেয়া হয়।

পরিষ্কার নির্দেশ, সন্দেহ করার কিছু নেই। তবু অভ্যেসবশে ফোনের রিসিভার তুলে কর্নেল ওয়াটসনের নম্বরে ডায়াল করলো ডিউটি অফিসার।

অপরপ্রান্ত থেকে যান্ত্রিক, একটু বেশি যান্ত্রিক, কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কর্নেল ওয়াটসন!'

'স্যার, গেট হাউস থেকে ডিউটি অফিসার বলছি···।'

'কি দরকার?' কর্নেল ব্যস্ত মানুষ, কাজের মধ্যে কেউ বিরক্ত করলে ধমক তো দেবেনই।

'স্যার, আপনার সেই ডেলিভারি ভ্যানটা এসেছে···।'

'গুড। কিন্তু তুমি ফোন করছো কেন তাই বলো।'

'স্যার, আমরা কি ওদের সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেবো···,' জানালা দিয়ে ডিউটি অফিসার দেখতে পেলো, ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে হোঁৎকা চেহারার চারজন লোক নিচে নামলো! গার্ডদের সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেছে ড্রাইভার, এবার বাকি চারজনও যোগ দিলো। গার্ডরা সতর্ক, কিন্তু লোকগুলো হাসছে।

'ডিউটি অফিসার? নাম কি তোমার?' অপরপ্রান্ত থেকে বজ্র-কণ্ঠে জানতে চাইলো কর্নেল। 'একটা অর্ডার ক'বার দিতে হয়? সকালেই তো ফোন করে বলে দিয়েছি··।'

'জ্বী, স্যার, সকাল বেলাই বলে দিয়েছেন··· আমতা আমতা করতে লাগলো ডিউটি অফিসার। 'ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে —ওদের সবাইকেই···রাখি, তাহলে, স্যার!' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ডিউটি অফিসার। ভাবলো, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, কর্নেল দ্বিতীয়বার তার নাম জানতে চাননি। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলো সে।

ডিউটি অফিসারের নির্দেশে গার্ডরা সরে দাঁড়ালো। ড্রাইভার আবার ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো। বাকি চারজন লোকদের বলা হলো তাদের ভেতরে ঢুকতে হবে গেট এ দিয়ে।

ড্রাইভার ভ্যান ছেড়ে দেবে, এই সময় ডিউটি অফিসার একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভ্যানের পিছনটা চেক করেছো? ওখানে একটা ফ্রিজ আছে, ভেতরটা দেখেছো?'

ফ্রিজের ভেতর থেকে কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা।

গার্ড বললো, 'অ্যাই ড্রাইভার, রোখো।'

মনে মনে প্রমাদ গুণলো ড্রাইভার, অসহায় ভঙ্গি করে চুপ করে থাকলো সে।

ভ্যানের পিছনে চড়লো দু'জন গার্ড। ডীপ ফ্রিজের দরজা বন্ধ। হাতল ধরে টানাটানি করলো তারা। আধ মিনিট পর ভ্যানের কিনারা থেকে তাদের একজন ডিউটি অফিসারকে বললো, 'ফ্রিজ খুলছে না। তালা দেয়া, চাবি লাগবে।'

ড্রাইভারের দিকে তাকালো ডিউটি অফিসার। 'চাবি দাও।'

বাকি চারজন লোক পাঁচিল ঘেঁষে গেট এ-র দিকে এগোচ্ছে।

'চাবি?' আকাশ থেকে পড়লো ড্রাইভার। 'আমি কোথায় চাবি পাবো?'

ডিউটি অফিসারের মনে সন্দেহ দেখা দিলো। 'চাবি কোথায় পাবে মানে? ফ্রিজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে, আর চাবি দেয়া হয়নি বলতে চাও? কি আছে ফ্রিজের ভেতর?'

'কর্নেল ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করুন, চাবি তাকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে,' ঝাঁঝের সাথে বললো ড্রাইভার। 'ফ্রিজে কি আছে?' হঠাৎ একগাল হাসলো সে। 'মেডিসিন। বাইরের টেম-

পারেচারে এক্সপোজ করা হলে মেডিসিনের সমস্ত গুণ ফুঁৎ হয়ে যাবে।' একটা কাগজ গুঁজে দিলো সে ডিউটি অফিসারের হাতে। 'এটা দেখুন, স্টোর থেকে দেয়া হয়েছে। ওষুধের তালিকা। বাইরে এক্সপোজ করলে কি হবে তা-ও লেখা আছে।'

চোখ কপালে উঠলো ডিউটি অফিসারের। 'ফুঁৎ হয়ে যাবে মানে?'

'মানে নষ্ট হয়ে যাবে।'

দশ সেকেণ্ড দ্বিধায় ভুগলো ডিউটি অফিসার। সেন্ট্রাল মেড়িকেল স্টোরের প্যাডে লেখা কাগজটার ওপর চোখ বুলালো। তারপর মাথা নাড়লো সে। 'কিন্তু ভেতরে কি আছে তা না দেখে আমি ওটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি না, কাগজে যা-ই লেখা থাক।'

'সেটা আপনার সমস্যা, অফিসার,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো ড্রাইভার। 'আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই করবো। বলেন তো মেডিকেল স্টোরে সব ফিরিয়ে দিয়ে আসি।' হাতঘড়ি দেখলো সে। 'খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট।'

'তুমি ঠিক জানো ফ্রিজের চাবি কর্নেল ওয়াটসনের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?'

ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজলো ড্রাইভার। 'জেনেই বলছি। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।'

গেট হাউসে টেলিফোন বাজছে। 'দাঁড়াও, আসছি,' বলে সেদিকে ছুটলো ডিউটি অফিসার।

গ্যাস-মাস্ক পরতে পরতে দরদর করে ফ্রিজের ভেতর ঘামছে রানা। ডীপ ফ্রিজের চাবি অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা কর্নেল ওয়াটসন ওরফে ভিনসেন্ট গগলের কাছে নয়, আছে লিলির কাছে। চাবি ছাড়াও ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে, সে-ব্যবস্থা রানার সাথেই আছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্রিজটা ওরা খুলতে চায় না, চাইছে যেমন আছে তেমনি যেন থাকে।

রানার উদ্বেগ বাড়তেই থাকলো। সব কিছু এখন ডিউটি অফিসারের ওপর নির্ভর করছে। কর্নেল ওয়াটসনকে ফোন করা হলে আবার সেটা রিসিভ করবে গগল, কারণ চীফ মেডিসিন কন্ট্রোলার কর্নেল ওয়াটসনের ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর লাইনটার সংযোগ দেয়া হয়েছে হাসপাতালের উল্টোদিকের সাততলা ভবনের একটা রিসিভারের সাথে। কামরাটা কাল ভাড়া করা হয়েছে, সামনে রিসিভার নিয়ে বসে আছে গগল। পাশেই জানালা, নিচের রাস্তায় হাসপাতালের দুই গেটে ভ্যান আর নিজের লোকদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। ফোন পেলে ডিউটি অফিসারকে গগল বলবে, ফ্রিজ খোলা যাবে না। কিন্তু তার কথা যদি লোকটা মানতে রাজি না হয়? তার বস-ও তো একজন কর্নেল, সে যদি নিজের বসের কাছে নির্দেশ চায়? তার বস হয়তো সরাসরি কর্নেল ওয়াটসনের সাথে দেখা করবে। সেই মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে সব। কর্নেল ওয়াটসন বলবে, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে ফ্রিজ আসছে তা-ই সে জানে না। ফোনের লাইনে যে কারিগরি কেরামতি করা হয়েছে, তা-ও জানাজানি হয়ে যাবে। ড্রাইভার সহ বাকি চারজনকে গ্রেফতার করা হবে, ভাঙা হবে ফ্রিজের দরজা। তারপর কি হবে, ভাবতে চায় না রানা। বন্ধ একটা কেবিনে গ্যাস বোমা বিস্ফোরিত হলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়, কিন্তু খোলা রাস্তায় বিস্ফোরিত হলে ক'জনকে অজ্ঞান করতে পারবে বলা কঠিন।

মাত ঘাবড়াও পেয়ারে, দেখোই না শেষ পর্যন্ত কি হয়। নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো রানা।

গেট এ থেকে ফোন করা হয়েছে। ওদিকের গেট হাউস থেকে ডিউটি অফিসার জানতে চাইছে, পাস ছাড়া চারজন লোককে সে ভেতরে ঢুকতে দেবে কিনা। রিসিভারে কড়া নির্দেশ জারি করলো গেট বি-র ডিউটি অফিসার, 'এদিকে ঘাপলা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমি না বলা পর্যন্ত লোকগুলোকে তোমাদের গেট হাউসে আটকে রাখো—কড়া পাহারায়।'

গেট হাউস থেকে বেরিয়ে আবার ভ্যানের পাশে এসে দাঁড়ালো ডিউটি অফিসার। ইঙ্গিত পেয়ে তার পাশে চলে এলো দু'জন গার্ড। 'নেমে এসো,' ড্রাইভারকে হুকুম করলো ডিউটি অফিসার। 'গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'কেন, গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে কেন?' ঘাবড়ে গেছে ড্রাইভার। 'হয় আমাকে ভেতরে ঢুকে মাল খালাস করতে দিন, নাহয় বিদায় দিন চলে যাই।'

'চলে যাবার জন্যে এতো ব্যস্ত কেন?' খোঁচা মারা প্রশ্ন করলো ডিউটি অফিসার। 'অপেক্ষা করতে হবে এই জন্যে যে কর্নেল হামফ্রে লাঞ্চ খেতে গেছেন, তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই।'

'কর্নেল হামফ্রে?'

'আমার বস।' ডিউটি অফিসারের চেহারা থমথম করছে।

তিনতালার একটা জানালা দিয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখছে লিলি। কি ঘটতে চলেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। ভ্যান থেকে নেমে এলো ড্রাইভার, ডিউটি অফিসারের সাথে মহা তর্ক জুড়ে দিয়েছে সে।

অস্থির হয়ে উঠলো লিলি। কিছু একটা করা দরকার। অথচ কিছুই তার করার নেই। পাঁচ মিনিট আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে দিয়ে হেঁটে এসেছে সে। কেবিনের বাইরে একজন

মাত্র মিলিটারী পুলিশ ছিলো। কেবিনের ভেতরটাও প্রায় খালি, শুধু একজন নার্স আছে। উঁকি দিয়ে আবছাভাবে দেখেছে সে। এখনই সুযোগ, একটু পরই সবাই আবার ফিরে এসে কেবিনে ঢুকবে।

গেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে ফ্রিজের দরজা খোলা নিয়ে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না লিলির। রবিন তাকে আগেই বলেছিল, এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা এড়াবার একাধিক বিকল্প সমাধান সংশ্লিষ্ট সবার জানা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই হয়তো কাজে আসবে না। এতো পরিশ্রম, এতো আয়োজন, সব বুঝি বিফলে গেল। সাদা কোটের পকেটে হাত ভরে চাবির অস্তিত্বটা অনুভব করলো লিলি। গেটে গিয়ে ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়াবে নাকি? চাবি দেখিয়ে বলবে, আমি ফ্রিজ খুলতে পারবো না, সাহস থাকলে আপনি খুলুন, কিন্তু ওষুধগুলো নষ্ট হলে আপনি দায়ী থাকবেন। উঁহুঁ, মস্ত বোকামি হয়ে যাবে। ডিউটি অফিসার অতো বোকা নয়। ফ্রিজের দরজা এক সেকেণ্ডের জন্যে খুলে আবার বন্ধ করলে ওষুধ যে নষ্ট হবে না, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। চাবি পেলে অবশ্যই ফ্রিজ খুলবে সে।

তখন গ্যাস বোমা না ফাটিয়ে রবিনের কোনো উপায় থাকবে না। তারমানে অপারেশন শিকেয় উঠবে। শুধু কি তাই, জান নিয়ে পালানোই দুষ্কর হয়ে পড়বে রবিন সহ বাকি পাঁচজনের।

এই সময় ভ্যানের পিছনে একটা মার্সিডিজ এসে থামলো। গাড়িটা আগেও একবার দেখেছে লিলি। কর্নেল হামফ্রের গাড়ি। লাঞ্চ সেরে খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছেন ভদ্রলোক।

ভ্যানের ড্রাইভারকে প্রায় জোর করে গেট হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই সময় কর্নেল হামফ্রের গাড়িটাকে ভ্যানের পিছনে

থামতে দেখলো ডিউটি অফিসার। ড্রাইভারের দায়িত্ব গার্ডদের ওপর ছেড়ে দিয়ে মার্সিডিজের দিকে ছুটলো সে। সামনে বাধা দেখে মহা বিরক্ত হয়েছেন কর্নেল, হর্নের বোতামে আঙুলের চাপ দিয়ে রেখেছেন।

ডিউটি অফিসারকে ছুটে আসতে দেখে হর্ন থামালেন কর্নেল, জানালা দিয়ে মুখ বের করে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'এসব কি, সার্জেন্ট ?'

'স্যার, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে একটা ডীপ ফ্রিজ আনা হয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিউটি অফিসার। 'কিন্তু ওরা বলছে ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে না। ভেতরে কি আছে না দেখে···।'

ফ্রিজের ভেতর থেকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কথাগুলো শুনছে রানা। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে!

'খোলো,' হাঁক ছাড়লো কর্নেল হামফ্রে। 'তারপর চাকরিটা হারাও!'

'জ্বী ?' হাঁ হয়ে গেল ডিউটি অফিসার। 'জ্বী, স্যার ?'

'জ্বী স্যার, না ? দূর হও সামনে থেকে!' খেপে গেছে কর্নেল হামফ্রে। 'ফ্রিজে লাখ ডলারের ওষুধ রয়েছে, আর উনি সেগুলো বাইরে এক্সপোজ করতে চান! তুমি দেখছি আমার চাকরিটাও খাবার তালে আছো!'

'না, স্যার, মানে আমি স্যার···।'

হুঙ্কার ছাড়লো কর্নেল, 'এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছো!'

চরকির মতো আধ পাক ঘুরে গেটের দিকে ছুটলো ডিউটি অফিসার। 'অ্যাই ড্রাইভার, জলদি ভ্যান সরাও—দেখছো না সারের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না!'

এরপর সব পানির মতো সহজ হয়ে গেল। হাসপাতালের উঠন পেরিয়ে বিল্ডিঙের গা ঘেঁষে থামলো ভ্যান। ফোন পেয়ে গেট এ-র গেট হাউস থেকে মুক্তি দেয়া হলো বাকি চারজন ভ্যান-কর্মীকে।

ফ্রিজের ভেতর নিঃশব্দে হাসলো রানা। কিন্তু একটু ভাবতে গিয়ে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল হাসিটা। বড় বাধাটা পেরোনো গেছে বটে, কিন্তু তাতে ওর কোনো কৃতিত্ব নেই।

তিনতলার জানালার সামনে থেকে সরে গেল লিলি। পরম স্বস্তি বোধ করলো সে। কয়েক পা হেঁটে করিডরের একটা বাঁকে থামলো, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেয়ালের হুক থেকে ফোনের রিসিভারটা নামালো। দুশো এগারো নম্বর কেবিনে ফোন করলো সে।

'ভ্যানেসা বলছি,' আহত লোকটার কেবিন থেকে জবাব দিলো নার্স।

'মেজর সুসান। পার্সোনেল অফিসে রিপোর্ট করবে, প্লিজ? লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার জায়গায় পনেরো মিনিট ডিউটি করবে সে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ কেটে দিলো লিলি।

দুশো এগারো নম্বর কেবিন। রিসিভার নামিয়ে রেখে রোগীর কাছে ফিরে এলো নার্স। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে রয়েছে। রোগীর পালস দেখলো সে। সন্তুষ্টচিত্তে আপন-মনে মাথা নাড়লো। তারপর, লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া এসে পৌঁছুবার আগেই, কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো সে। 'অফিস থেকে ডাকলো আমাকে,' মিলিটারী পুলিশকে বললো সে। 'লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া এখুনি আসবে।'

করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল নার্স। বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এলো উঠনে, উঠন থেকে গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তার মোড়ে তার জন্যে

একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

তিন মিনিট এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে এসে থামলো লিলি।

'লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া?' জিজ্ঞেস করলো মিলিটারী পুলিশ।

'হ্যাঁ,' কেবিনের ভেতর ঢুকতে শুরু করে বললো লিলি। তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো এম. পি.-র দিকে। 'ফ্রিজটা বদলে দিয়ে গেছে?'

হাতঘড়ি দেখলো এম. পি.। 'দেড়টার সময় নতুনটা নিয়ে আসার কথা, কই, এখনো তো এলো না।'

'এসে যাবে,' বলে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো লিলি।

ওদিকে, তিনতলায় থামলো এলিভেটর। ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে করিডরে বের করে আনলো ভ্যান-কর্মীরা। ভেতরের দেয়ালে বার-বার মাথা ঠুকে যাচ্ছে রানার। দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে পৌঁছে গেল ফ্রিজ, খাড়া করে দরজার পাশে রাখা হলো সেটা। রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে হাঁপাতে লাগলো ভ্যান-কর্মীরা।

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি,' তাগাদা দিলো এম. পি.। 'এখানে জটলা পাকানো চলবে না।'

ভ্যান-কর্মীরা আবার ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে শূন্যে তুললো। এতোক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলো রানা, এখন শোয়া অবস্থায়, তা-ও উপুড় হয়ে।

দরজায় নক করলো এম. পি.। সাথে সাথে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো লিলি। ভেতরে ঢোকানো হলো ফ্রিজ। ভ্যান-কর্মী-

দের পিছু পিছু এম. পি.-ও কেবিনের ভেতর ঢুকলো। পুরনো ফ্রিজটার পাশেই রাখা হলো নতুনটাকে। রুমাল বের করে আবার ঘাম মুছতে শুরু করলো ভ্যান-কর্মীরা, আবার তাড়া দিলো এম. পি., 'কাজটা শেষ করো। পুরনোটা, নাকি মাল খালাস করে নতুনটাই আবার নিয়ে যাবে ? যা করবার তাড়াতাড়ি করো।'

'একটু দেরি হবে,' এম. পি.-কে বললো লিলি। 'ওরা নাহয় ততোক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করুক ?'

'অ্যাই, বাইরে, সবাই বাইরে!' চারজনের দলটাকে খেদিয়ে বাইরে নিয়ে এলো এম. পি.। ভেতর থেকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলো লিলি।

নতুন ডীপ ফ্রিজটার সামনে চলে এলো সে। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ঢোকালো, চাবিটা ঘোরাবার আগে ফ্রিজের গায়ে টোকা দিলো—ঠক, ঠক-ঠক।

ফ্রিজের ভেতর কোনো র‍্যাক বা শেলফ নেই, ডাক্তারের পোশাক পরে সটান দাঁড়িয়ে আছে রানা। মুখে গ্যাস-মাস্ক, এক হাতে ডাক্তারী ব্যাগ, অপর হাতে গ্যাস-গান। ছোট্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো ও, দ্রুত হাতে ফেস-মাস্ক খুলে ফেললো। সাদা কোটের পকেটে ভরলো গ্যাস-গান। গ্যাস-মাস্কটা ব্যাগের ভেতর চালান করে দিলো। 'এসো, আমার সাথে ধরো ওকে,' বলে পর্দা ঘেরা কেবিনের ওপর অংশের দিকে এগোলো ও।

আহত লোকটার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। দেখেই বোঝা যায়, জ্ঞান নেই। নাক-মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে অনেকগুলো পাইপ আর টিউব। মুখটা বাদে সারা শরীর াদর ঢাকা। রক্তবাহী টিউব চাদরের তলায় ঢুকে গেছে। স্বচ্ছ টিউবটার দিকে

চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল রানা, ঝট্ করে তাকালো মাথার কাছে স্ট্যাণ্ডের সাথে ঝুলে থাকা ব্লাড-ব্যাগের দিকে। ব্যাগ থেকে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত পড়ার কথা টিউবে, কিন্তু পড়ছে না। চাদর সরিয়ে রোগীর পালস্ দেখলো রানা।

'কি ব্যাপার, রবিন?' পাশ থেকে ফিসফিস করে জানতে চাইলো লিলি।

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। খুন, নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝলো, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির কব্জি ধরলো ও, লম্বা পা ফেলে কেবিনের অপর অংশে বেরিয়ে এলো। ব্যাগ হাতে ডীপ ফ্রিজের ভেতর ঢুকে বললো, 'তালা লাগাও। ওদের ডেকে আবার নিচে নামাতে বলো ফ্রিজ-টাকে।'

তর্ক না করে নির্দেশ পালন করলো লিলি। কেবিনের দরজা খুলে ভ্যান-কর্মীদের বললো, 'এসো তোমরা, ফ্রিজ খালি করা হয়েছে।'

ওদের সাথে এম. পি.-ও ঢুকলো কেবিনে। আবার ওদের সাথেই বেরিয়ে এলো। ফ্রিজ নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোলো চারজন। এম. পি. কেবিনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। কেবিন থেকে লিলি বেরুলো না, তবে ফ্রিজটা যখন বের করা হচ্ছিলো তখন এম. পি.-র চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন ভ্যান-কর্মীর পকেটে ফ্রিজের চাবিটা ফেলে দিয়েছে সে।

এক মিনিট পর দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো লিলি। 'বাথ-রুম থেকে আসছি,' বলে ফ্রিজ যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার উল্টো দিকে হাঁটা ধরলো সে।

বাঁক ঘুরলো লিলি, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে টয়লেট

লেখা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো সে। ইউনিফর্ম পরা তিনজন হাসপাতাল-কর্মী বন্ধ একটা দরজার সামনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে একটা মেয়ে বলে চলেছে, 'নিশ্চয়ই কোনো পাগলের কাণ্ড! তা না হলে সবগুলো দরজায় তালা দেয় কেউ!'

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,' হাসপাতাল কর্মীদের একজন উত্তর দিলো। 'আমরা সবাই টয়লেটে যাবো বলে এসেছি। এসে দেখি, সবগুলো দরজায় কে যেন তালা লাগিয়ে গেছে। ভ্যানেসা রিকার্ড একটার ভেতর ছিলো, তার টয়েলেটেও। দশ মিনিট ধরে চেঁচামেচি করছে ও। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম, তা না হলে জানাই যেতো না···।'

'চাবি?'

লোকটা বললো, 'অফিস থেকে আনতে পাঠানো হয়েছে।'

জোর করে হাসলো লিলি। 'নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে···।'

'এমন ভুল মানুষ করে!' ক্ষোভ প্রকাশ করলো লোকটা। বাকি দু'জনও তিক্ত মন্তব্য করলো।

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো লিলি। সেই লেফটেন্যান্ট-নার্সের কথা মনে পড়ছে ওর। একই বাসে এসেছে ওরা, তার মতো সে-ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হাসপাতালে এখানে-সেখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল। টয়লেটগুলোর দরজায় সে-ই কি তালা দিয়েছে? নার্স ভ্যানেসাকে টয়লেটে বন্ধ করে রেখে দু'শো এগারো নম্বর কেবিনে নিজে গিয়েছিল? সে-ই কি তাহলে রিসিভ করেছিল তার ফোন কল? সে ভ্যানেসা নয়, সেজন্যেই কি গ্লোরিয়া পৌঁছুবার আগেই

দুশো এগারো নম্বর কেবিন থেকে কেটে পড়ে ?

রোগীটাকে তাহলে কি সে-ই খুন করে গেছে ?

তাকে কি কে. জি. বি. রেসিডেন্ট পাঠিয়েছিল ?

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে একতলায় নেমে এলো লিলি। এসে দেখলো, আরেক কাণ্ড বেধে গেছে। ফ্রিজটা তোলা হয়েছে ভ্যানে, কিন্তু গেটে আবার থামানো হয়েছে ড্রাইভারকে। আগের ডিউটি অফিসার নেই, লাঞ্চ খেতে গেছে, নতুন ডিউটি অফিসার ফ্রিজের ভেতরটা না দেখে ভ্যান ছাড়বে না।

এবার আর চাবি নেই বা অন্য কিছু বলে পার পেলো না ড্রাইভার। কারণ জেরার উত্তরে আগেই সে বলে বসেছে, ফ্রিজ খালি। ভ্যান-কর্মীদের একজন পকেট থেকে ফ্রিজের চাবি বের করে ডিউটি অফিসারের হাতে দিলো। দু'জন গার্ডকে নিয়ে নিজে ভ্যানে চড়লো অফিসার। খোলা হলো ফ্রিজের দরজা।

কিছুই নেই, ফ্রিজের ভেতরটা খালি।

উঠনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছে লিলি, কাঁধে একটা হাত পড়লো।

'চলো, বাইরে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে,' বললো রানা। একটুও অবাক হয়নি লিলি। সে জানে, এলিভেটর একতলায় নামার সময় ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন।

অপর গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওদিকে ভ্যানের ড্রাইভারও ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

পার্কিং লটে এসে গাড়িতে চড়লো ওরা। মেইন হাইওয়েতে উঠে এলো গাড়ি। থমথম করছে রানার চেহারা।

টয়লেটে গিয়ে কি দেখেছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করলো লিলি। চুপ-

চাপ শুনলো রানা। লিলি থামার পর মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করলো ও, 'বাস্টার্ডস !'

'তাহলে আমি যা ভেবেছি সেটাই ঠিক ?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'হ্যাঁ, লোকটাকে খুন করা হয়েছে,' বললো রানা। 'আমাদের এতো চেষ্টা কোনো কাজেই লাগলো না।'

'কিন্তু খুনটা করলো কিভাবে ?'

'কি জানি, আমি তো কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না। তবে মেয়েটা যে রেসিডেন্টের একজন এজেন্ট এ আমি হলপ করে বলতে পারি।' হঠাৎ খেপে গেল রানা, 'ওরা মানুষ নয়, লিলি ! আমার ওপর ওদের কোনো বিশ্বাস নেই। লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি, অথচ আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিলো না। নিজেদের লোককে মেরে ফেললো—ছি !'

রানাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো লিলি, 'আমরা যা ভাবছি তা না-ও হতে পারে, রবিন। লোকটা হয়তো নিজে থেকেই মারা গেছে… ।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়লো।

একটু পর জিজ্ঞেস করলো লিলি, 'এখন আমরা কি করবো ?'

'আমাকে অপমান করা হয়েছে, লিলি,' বিষণ্ণ এবং গম্ভীর দেখালো রানাকে। 'নির্মম হতে পারলে আমার উচিত অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেশে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তা যদি যাই, এই একই ভাবে আরো অনেক লোককে খুন করবে ওরা। শুধু ওদের কথা ভেবে… ।'

'কাদের কথা ?'

'সব কথা জানতে চেয়ো না,' নরম সুরে বললো রানা।

বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো লিলি, 'দুঃখিত, রবিন।'

'না, কাজটা ফেলে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আপনমনে বললো রানা।

'আমরা এখন কি করবো বলবে, নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে?' অভিমানের সাথে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'গোটা ব্যাপারটার জন্যে যে দায়ী, সেই ম্যানিয়াকটাকে খুঁজে বের করবো,' বললো রানা। বললো বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কোথায় পাওয়া যাবে ডালচিমস্কিকে। দায়িত্বটা নেয়ার সময়ই মনে হয়েছিল, ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। এখনো তাই মনে হচ্ছে। হিউম্যান বোমাগুলোকে এক এক করে ফাটিয়ে চলেছে ডালচিমস্কি, এখন আবার কে. জি. বি. রেসিডেন্টও একই পথ ধরেছে। এমন হবে জানলে শত অনুরোধেও কি ঢেঁকি গিলতো ও!

লাঞ্চ খাবার জন্যে ফ্রেঞ্চ একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলো ওরা। রানাকে অন্যমনস্ক দেখে নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সারলো লিলি। গগলের কথা ভাবছিল রানা।

ভিনসেন্ট গগলের সাথে রানার পরিচয় আজকের নয়। দু'জন দু'মেরুর বাসিন্দা, একজনের সাথে আরেকজনের কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই। সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, কিন্তু সে বন্ধুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। রানা জানে ভিনসেন্ট গগল একজন আন্তর্জাতিক স্মাগলার, ভূমধ্যসাগরের দু'তীরে যতোগুলো সন্ত্রাসবাদী দল আছে সেগুলোর প্রায় সব ক'টাকেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ যোগান দেয় সে। তার জাতীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কেউ কিছু জানে না। তার কোনো কোনো আচরণে আভাস পাওয়া যায়, ফ্রেঞ্চদের প্রতি তার দরদ আছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সে

সমর্থন করে। রানা তার সম্পর্কে বিশদ জানার জন্যে অন্যায় কৌতূহল কখনোই প্রকাশ করেনি, আবার রানা সম্পর্কে গগলও তার কৌতূহলের মাত্রা একটা সীমার বাইরে যেতে দেয়নি। সে নিজে যেমন, রানাকেও সেরকম একজন বলে সন্দেহ করে সে—গভীর জলের মাছ, হয় স্মাগলার নাহয় আণ্ডারগ্রাউণ্ডের রাঘব-বোয়াল। গগলের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে রানা, ওর মধ্যে লোক দেখানো কোনো ব্যাপার নেই। কেউ যদি তার কোনো উপকার করে, মৌখিক একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না, পাল্টা কোনো উপকার করে ঋণ শোধের অপেক্ষায় থাকে। অনেক গুরুতর সংকটে গগলকে সাহায্য করেছে রানা, কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি কোনো বড় ধরনের ক্রাইম করতে গিয়ে গগল সংকটে পড়েছিল কিনা। সেরকম রানার ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে এসে গগলও কখনো জানতে চেষ্টা করেনি ঠিক কোন্ ধরনের অপরাধ করতে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছিলো রানা।

ওদের বন্ধুত্বের ভিৎ হলো বিশ্বাস, সেটা এতো গভীর আর শক্তিশালী যে কোনোদিন নষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

কিছুদিন থেকে গগলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে রানা। এতোদিন স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিলো না তার, বেশিরভাগ সময় ইয়ট নিয়ে সাগর চষে বেড়াতো। হঠাৎ কি মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে সে, বাড়িও কিনেছে। প্রচুর মদ খেতো, যদিও মাতাল হতো না, ইদানীং মাত্রাটা অনেক কমেছে। এতো দিন তাকে প্রায় জলচর বলে জেনে এসেছে রানা, হঠাৎ তার এই ডাঙার প্রতি আকর্ষণ কি তাৎপর্য বহন করে জানা নেই রানার। স্থিতি চায় গগল? বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হতে চায়? নাকি অন্য

কোনো উদ্দেশ্য আছে তার ?

আজ হঠাৎ করে দু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পেলো রানা। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, দু'জনের বেলাতেই এ যেন কল্পনা করা যায় না। পেশা যাই হোক, ভিনসেন্ট গগল আপাদ-মস্তক একজন অ্যাডভেঞ্চারার। রানাও কি তাই নয়? কোনো ধরনের বাঁধনই ওদের ধাতে সইবে না।

একজন আরেকজনের বিপদে সাহায্য করেছে, প্রতিদান দিয়েছে, বেশ কিছু দিন হিসেবটা নিভুল ছিলো। কিন্তু তারপর আর হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। কে যে এখন ঋণী, দু'জনের কেউই এখন আর তা বলতে পারবে না। এই অ্যাসাইনমেন্টে গগলের আরো সাহায্য দরকার হবে রানার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো ও, নিকট ভবিষ্যতে লোকটার জন্যে কিছু একটা করতে হবে ওকে।

রানা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নয়। ওর জানা নেই ঋণের বোঝা এখন থেকে শুধু বাড়তেই থাকবে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। টোপেকা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটলো গাড়ি। রেডিওটা অন করলো রানা। টনি বেনেটের গান বাজছে। রেকর্ডটা শেষ হতে খবর পড়া শুরু হলো।

'ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মিলিটারী হাসপাতাল থেকে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছেন, আজ কিছুক্ষণ আগে টিম পারকার মারা গেছে। আপনারা আগেই জেনেছেন, তাকে অন্তর্ঘাতক বলে সন্দেহ করা হচ্ছিলো। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার আর জ্ঞান ফিরে আসেনি।...।'

এটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সি. আই. এ. ঠিকই তা জানতে

পারবে, ভাবলো রানা। কিন্তু খবরটা প্রচার করবে কিনা সন্দেহ আছে।

রানার চিন্তা অন্য খাতে বইতে শুরু করলো। ম্যানিয়াকটা এই মুহূর্তে কোথায়? কি করছে সে? এরপর কোথায় আঘাত হানবে ডালচিমস্কি? মন বলছে আবার তার আঘাত করার সময় হয়ে গেছে।

ঠিকই বলছে মন।

চোদ্দ

ক্যাপটেন মাক্সিম ইলিয়টসিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন কে. জি. বি. রেসিডেন্ট। মস্কোয় খবরটা পাঠাবার আগে দুই চুমুকে দুই আউন্স ভদকা গলধঃকরণ করলেন তিনি। মস্কো থেকে নির্দেশ পাবার পরপরই একজন যোগ্য মেয়ে এজেন্টকে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বেচারা হাসপাতালে ঢুকতে পারলেও প্রথম দু'দিন ইলিয়টসিনের দুশো এগারো নম্বর কেবিনে ঢুকতে পারেনি। তার তৃতীয়বারের চেষ্টা সফল হয়, এবং একবার কেবিনে ঢোকার পর বাকি কাজটা পানির মতো সহজে সেরে ফেলে।

হাইপডারমিক সিরিঞ্জ শিরায় ঢুকিয়ে তরল কোনো ওষুধ নয়, স্রেফ বাতাস ইঞ্জেক্ট করে সে। সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। ইলিয়টসিনের হাতে ইঞ্জেকশন পুশ করার অনেক দাগ আছে, অতিরিক্ত একটা দাগ আলাদাভাবে কারো চিনতে পারার কথা নয়। কাজেই মৃত্যুর কারণটা কেউ ধরতে পারবে না, সবাই ধরে নেবে গুরুতর আহত হওয়ার কারণেই তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন ওরফে টিম পারকারকে যারা পাহারা দিচ্ছিলো, মৃত্যুটাকে নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা রইলো না। কারো দুঃখ, কেন তাকে সময়ের আগে লাঞ্চ খেতে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো অফিস থেকে? আবার কারো দুঃখ, কেন তাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অফিসে ফিরে আসতে বলা হলো? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কয়েকটা ব্যাপার মেলাতে না পারলেও, মৃত্যুটাকে তারা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত বলেই ঘোষণা করলো। নার্স ভ্যানেসার টয়লেটে আটকা পড়ে থাকার ঘটনাটা কারো কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি করলেও, কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখলো। তাদের ধারণা, কেয়ারটেকারদের কেউ একজন ভুল করে কাজটা করেছিল। আর ডীপ ফ্রিজের ব্যাপারটা স্রেফ চাপা পড়ে গেল। এ-ব্যাপারে যে লোকটা আলোড়ন তুলতে পারতো, সেই কর্নেল ওয়াটসন অকস্মাৎ ছুটি নিয়ে লাস ভেগাস না কোথায় যেন চলে গেছে।

সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হলো এফ. বি. আই.। তাদের এজেন্টদের ভুয়া ফোন কলের মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা তাদেরকে হতাশ করতে পারলো না। মৃত টিম পারকার সম্পর্কে আরো জোরেশোরে তদন্ত শুরু করলো তারা।

এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখালেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরদের একজন। তিনি ভাবতে লাগলেন, টিম পারকারের কাগজ-পত্র এবং আইডেনটিটি জাল কেন? এবং, ডেনভারের কাছে আর্মি বেসে হামলা চালিয়েছিল যে লোকটা, তারই মতো এর জাল কাগজগুলোও প্রায় সম মানের উন্নত কেন?

দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ থাকতে পারে।

হতে পারে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। হয়তো এর পিছনে ইন্টাররেশিয়াল টেরোরিস্ট কোনো গ্রুপ জড়িত আছে। এই একটা ব্যাপারে এফ. বি. আই. অদ্বিতীয়; ষড়যন্ত্র আবিষ্কার এবং তা নস্যাৎ করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই। তদন্ত পুরোদমে চলতে লাগলো।

ওদিকে হান্টিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় এফ. বি. আই.-এর জন্যে আরেকটা সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। ভদ্র এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বহু লোক বাস করে হান্টিংটনে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বার্নার্ড কোরম্যান, একজন বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। ঝাড়া ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা সে, পেশীবহুল শরীর। বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে তার, হালকা রসিকতা করার লোক সে নয়, শহরের গণ্যমান্যদের সাথেই ওঠাবসা। উনিশশো ষাট—নাকি উনিশশো একষট্টি?—সালে কেণ্টাকি থেকে এসে ফোরম্যান হিসেবে কাজ শুরু করে সে। দু'বছর কাজ করে ছোটোখাটো কয়েকটা খনি কিনে ফেলে। সেগুলোর একটা এখনো আছে তার, হান্টিংটন থেকে এগারো মাইল দূরে। বলাই বাহুল্য, খনিটা সাত রাজার ধন নয়, বছর কয়েক ধরে সেখান থেকে কিছু তোলাও হয়নি। তবু বন্ধু-বান্ধবকে বলে বেড়ায়, কয়লার দাম কখনো যদি চড়ে তাহলে আবার উৎপাদন শুরুর কথা ভাববে

সে। তার বন্ধুদের একজন হলো হান্টিংটনের পুলিশ চীফ, প্রায়ই দু'জনে শিকার করতে বেরোয়। দু'জনই সৎ, এবং সরল মানুষ, আইন-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে, পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালো-বাসে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনে বিশ্বাসী, কঠোর পরিশ্রম করতে জানে—আদর্শ আমেরিকান নাগরিক বলতে যা বোঝায় তাই।

এগারোই জুলাই বিকেল বেলা কোরম্যান তার ওয়্যারহাউসের গেটে তালা লাগালো, কাল সকালের আগে কোনো সাইটেই আর নির্মাণ সামগ্রী পাঠাবার দরকার নেই। সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন, এই সময় অফিস কামরা থেকে খবর এলো তার টেলিফোন এসেছে।

কয়েক মিনিট পর নিজের ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপে চড়লো কোরম্যান। দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে ছুটলো জীপ। বিশ মিনিট পর রাস্তার দু'পাশে পরিত্যক্ত খনিগুলোকে দেখা গেল, এদিকের রাস্তা চাঁদের পিঠের মতো খানাখন্দে ভরা। খনিগুলো সরু একটা উপত্যকার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, হেডসেট ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই গোটা এলাকায়।

হেডসেট হলো একটা সাবটেরেনিয়ান কমাণ্ড পোস্টের সাংকে-তিক নাম, যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ পোস্টটাকে ব্যবহার করলেও করতে পারেন। বোমা, গ্যাস, আর জার্ম প্রুফ একটা বাঙ্কার, ভেতরে রয়েছে আধুনিক কমিউনিকেশন গিয়ারের বিশাল আয়োজন। উনিশ শো আটান্ন সালে পাথর খুঁড়ে, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি করা হয় পোস্টটা, সেই থেকে ছোট্ট একটা সিকিউ-রিটি ট্রুপ আর রেডিও টেকনিশিয়ানদের ক্ষুদে একটা দলকে সারা-ক্ষণ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। অফিশিয়ালি বলা হয়, এটা স্রেফ পুরনো একটা খনি, অতিরিক্ত অ্যামুনিশন রাখার জন্যে গুদাম

হিসেবে ব্যবহার করছে আর্মি। উপত্যকার শেষ প্রান্তটা ব্যারিকেড দিয়ে সীল করে দেয়া হয়েছে, প্রাইভেট যানবাহন ওদিকে যাতে যেতে না পারে।

নাক বরাবর সোজা হেডসেটের দিকে গেল না কোরম্যান। গাড়ি নিয়ে রিজের মাথায় উঠে এলো সে, থামলো চূড়া থেকে খানিকটা নিচে—দিগন্তের গায়ে যাতে তার বা জীপের কাঠামো দেখা না যায়। গাড়িটাকে পাইন বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালো সে। দু'একটা টান দিয়ে নেভালো সেটা, তারপর বনের পথ ধরে দেড় মাইল হেঁটে কাঁটাঝোপের কিনারায় এসে থামলো। চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে মাথা-সমান উঁচু কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকলো কোরম্যান। কষ্টকর অভিযান, কাপড় ফুঁড়ে মাংসে ফুটছে ধারালো কাঁটাগুলো। কিন্তু থামলো না সে। এভাবেই এক সময় লুকানো মেটাল বক্সের কাছে পৌঁছে গেল।

ছটা চোদ্দ মিনিটে ডিটোনেটরে চাপ দিলো সে। পাহাড়টা ধ্বসে পড়লো। বিস্ফোরণের ফলে হাজার টনেরও বেশি মাটি আর পাথর ঢাল বেয়ে নেমে এলো সবেগে। মাটির ওপর হেডসেটের ছোটো দুটো বিল্ডিং ছিলো, ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশে গেল সেগুলো। সেই সাথে কমাণ্ড পোস্টের প্রবেশ মুখ পাথর আর মাটিতে চাপা পড়ে গেল। টন টন পাথর ঢুকলো বাঙ্কারে, ভারি লোহার দরজাগুলো এমনভাবে দুমড়েমুচড়ে গেল, ওগুলো যেন অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ডিটোনেটরে চাপ দেয়ার সময় হেডসেটে কাজ করছিল তেষট্টিজন লোক, প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে একান্ন জন মারা গেল, বাকি সাতজন পরের হপ্তায় মারা গেল হাসপাতালে।

হতাহতের সংখ্যা বা হেডসেট রহস্য সম্পর্কে সরকারী সূত্র থেকে রিপোর্টাররা কিছুই জানতে পারলো না। জায়গার নাম উল্লেখ না করে শুধু বলা হলো, একটা আর্মি ডিপোয় দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে চারজন লোক মারা গেছে। পেন্টাগন থেকে ইনভেস্টিগেটররা এলো ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে, লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে কেউ ইউনিফর্ম পরেনি। গোটা এলাকা পরীক্ষা করলো তারা, কিন্তু ডিনামাইটের সামান্য কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তারা আবিষ্কার করতে পারলো না। ডিনামাইটের অংশ পরীক্ষা করে বিস্মিত হলো তারা। কারণ এই ব্র্যাণ্ডের ডিনামাইট ষোল বছর আগে ব্যবহার করা হতো। পাথর আর মাটির বিশাল ঢল বিস্ফোরণের বাকি সমস্ত চিহ্ন চাপা দিয়ে ফেলেছে।

বার্নার্ড কোরম্যান নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। সিকিউরিটি এজেন্টরা অকুস্থলে পৌঁছুবার অনেক আগেই রাইফেল, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, এক মাসের শুকনো খাবার, আর একটা শর্টওয়েভ রেডিও নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে সে। যতোদূর সম্ভব জীপে করে এগিয়েছে, তারপর পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের একটা গুহায় ক্যাম্প করেছে সে। প্রতিদিন সকালে সে তার ব্যাটারিচালিত রেডিও সেটটা অন করে, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি-তে কাঁটা স্থির রেখে নির্দেশ আর যুদ্ধের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকে। কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল। তাকে কোনো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে না, যুদ্ধেরও কোনো খবর নেই। ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না কোরম্যানের। নিখুঁত ডীপ কভার এজেন্ট হতভম্ব হয়ে পড়লো, কিন্তু ধৈর্য হারালো না। ঠিক করলো, অপেক্ষা করবে সে। নতুন অর্ডার দিতে বাধ্য তারা। কর্তৃপক্ষ তার কথা ভুলে যেতে পারে না। তারা জানে,

এরপর কি করতে হবে তা তার জানা নেই।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাপ্তাহিক মিটিঙে আলোচ্য সূচীর তেরো নম্বর বিষয় ছিলো--সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারী-দের অস্বাভাবিক মৃত্যুহার। ষোলো নম্বর স্থান পেয়েছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-র ঘটনাটা।

সরাসরি জিল ক্যাসেল, সি. আই. এ. প্রতিনিধির দিকে তাকালো ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি। 'আপনাদের সেই মেয়েটা, কি যেন নাম ছাই—ওই যে, রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের মৃত্যু-হার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল যে?'

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি, একজন মেজর জেনারেল, সহাস্যে বললেন, 'ভাষা ব্যবহারে আমাদের আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার, জেন্টলমেন। চ্যারিটি উডস্টককে মেয়ে বলা—,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। '—বোধহয় উচিত নয়।'

'আমি আপনার সাথে একমত,' তাকে সমর্থন করলো জিল ক্যাসেল। 'চ্যারিটি উডস্টক পরিণত, দায়িত্বসচেতন, ক্রিয়েটিভ একজন অ্যানালিস্ট--আমরা তাকে এজেন্সির গর্ব বলে মনে করি।'

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডমিরাল পাইপে টোবাকো ভরছেন। মুখ না তুলেই তিনি কথা বললেন, 'বড় বড় নব, তার কথা বলা হচ্ছে তো, নাকি?' সবাই জানে, মার্কিন নেভির অফিসাররা অশ্লীল শব্দ ছাড়া মুখ খুলতে পারে না। 'আপনাদের এজেন্সির গর্ব, তাতে আর সন্দেহ কি। সে যাক, অস্বাভাবিক মৃত্যুহার থেকে আর কিছু জানতে পেরেছে সে? ব্যাপারটা কি একটা ম্যাসাকার ছিলো?'

'আমাদের তাই ধারণা,' জবাব দিলো জিল ক্যাসেল। 'মিস উড-

স্টকের ধারণা, স্ট্যালিনপন্থীদের একটা গ্রুপ বিদ্রোহ করে বসেছিল।'

'বিদ্রোহ নিশ্চয়ই দমন করা হয়েছে?'

'বলা মুশকিল, অ্যাডমিরাল। বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়, বহু লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে—বেশিরভাগই আর্মি আর কে. জি. বি.-র লোক।' আরো অনেক তথ্য জানা আছে জিল ক্যাসেলের, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও বলবে না সে।

আবার যখন ষোলো নম্বর আলোচ্য বিষয় উঠলো, প্রথম প্রশ্ন এলো এফ. বি. আই. প্রতিনিধির তরফ থেকে। 'ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় কি ঘটেছে, আর্মি ইন্টেলিজেন্সই তা ভালো বলতে পারবে। কিন্তু আর্মিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা সি. আই. এ.-কে জিজ্ঞেস করতে বলে। রহস্যটা কি? এতোগুলো লোক মারা গেল, কারা দায়ী? এভাবে তথ্য চেপে রাখা হলে তার পরিণতি যে ভালো হতে পারে না, সে-কথা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি?'

জিল ক্যাসেল বললো, 'ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার দরকার নেই। আর্মির ধারণা হয়েছে, পাথর আর মাটির ঢল-টা এমনি এমনি না-ও নেমে আসতে পারে, কেউ হয়তো নেমে আসতে সাহায্য করেছে। ব্যাপারটার সাথে বিদেশী কোনো শক্তি জড়িত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আর্মি আমাদেরকে অনুরোধ করেছে।'

'বেশ, অনুরোধ করেছে,' এফ. বি. আই. প্রতিনিধি বললো। 'এখন বলুন, পরীক্ষা করে কি পেলেন আপনারা?'

'কিছুই পাইনি। কাজটা সম্ভবত কোনো হাসপাতাল পালানো পাগলের। আপনাদের আগ্রহ থাকলে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোনো হাসপাতাল থেকে পাগল-ছাগল কেউ পালিয়েছে কিনা। কমাণ্ড

পোস্টটা টপ সিক্রেট তালিকায় ছিলো, ওটার অস্তিত্বের কথা রাশিয়া, কিউবা, বা চীনের জানার কথা নয়।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, অর্থটা বুঝতে কারো বাকি থাকলো না। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা হয় ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইভে। গ্রুপ সিক্স মিটিঙে বসেছে শুধু বৈদেশিক সমস্যা আর প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

পরদিন সকালে সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই জিল ক্যাসেল খবর পেলো, ডিরেক্টরের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট বেন সুইটল্যাণ্ড তাকে দেখা করতে বলেছে। সাথে সাথে তার চেম্বারে হাজির হলো সে।

'ব্যাপারটা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, ক্যাসেল?' জানতে চাইলো বেন সুইটল্যাণ্ড। 'সব ঠিকমতো চলছে, নাকি লেজেগোবরে করে ফেলেছো? কন্ট্রোল রুম থেকে খবর পেলাম···।'

'সব ঠিক মতোই চলছে, বেন,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলো কর্নেল। 'কন্ট্রোল রুম তোমাকে ঠিকই রিপোর্ট দিয়েছে— কিন্তু মাত্র একটা বালব ফিউজ হয়েছে, দ্বিতীয়টা ঠিকই জ্বলছে।'

'তা না হয় জ্বলছে,' কর্কশ গলায় বললো বেন সুইটল্যাণ্ড। 'কিন্তু তোমার কাজিন ফোন করে কি জানতে চেয়েছে শোনোনি?'

'তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলবো, তুনিয়ার বড় বড় সব ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে আমাদের চর আছে, আমাদের এখানে তাদের ত্থ'একজন থাকবে না, তা কি করে হয়?'

'বেশ, যুক্তিটা মানলাম।' বেন সুইটল্যাণ্ড গম্ভীর। 'কিন্তু তাদের ধরার কি ব্যবস্থা নিচ্ছো, নাকি এখন পর্যন্ত···?'

'সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, বেন। ফাঁদ পাতা হয়েছে। আশা

করছি তু'একদিনের মধ্যেই তাকে আমরা ধরতে পারবো। তুমি তো জানোই, আমাদের লোকের খুব অভাব।'

'লোকের অভাব? সারা দিন কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করে যারা তাদের এবার কিছু কাজ দাও না!'

'কার কথা বলছো, বেন?' এবার জিল ক্যাসেলও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

'এই যেমন ধরো চ্যারিটি উডস্টক,' বললো বেন সুইটল্যাণ্ড। 'ইয়া বড় 'একজোড়া ইয়ে' নিয়ে···থাক, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ-কথা তো সত্যি যে চেয়ারে বসে কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। না, ভুল হলো, আরো একটা কাজ আছে তার—মহিলা কর্মীদের উত্তেজিত করা। শুনলাম, অফিসে নাকি নারী-স্বাধীনতার ওপর রীতিমতো ভাষণ দেয় সে!'

জিল ক্যাসেল অপমান বোধ করলো। তার কর্মচারী সম্পর্কে কটূক্তি করা মানে তাকেই অপমান করা। তবু, সুইটল্যাণ্ডের প্রভাবের কথা মনে রেখে তর্কের মধ্যে গেল না সে। ঠিক আছে, দেখবো, বলে চলে এলো।

নিজের অফিস কামরায় ফিরে চ্যারিটি উডস্টককে ডেকে পাঠালো জিল ক্যাসেল।

একটু পরই হাজির হলো চ্যারিটি উডস্টক। আজ তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সুইটল্যাণ্ডের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব তাকে শোনালো কর্নেল, আপত্তিকর অংশগুলো বাদ দিয়ে। তারপর বললো, 'একটা ভাঁড়, কে তার সাথে তর্ক করতে যায়।'

কথা বলতে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গলায় বেধে গেল, বিষম খেলো

চ্যারিটি উডস্টক। খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করলো সে। জিল ক্যাসল মুখ তুলে তাকালো, এবং তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। হঠাৎই আবিষ্কার করলো সে, চ্যারিটি উডস্টক সেই নতুন ব্রা-টা পরেনি আজ। না, কোনো ব্রেসিয়ারই পরেনি! অদ্ভুত তো! কিন্তু কেন?

জিল ক্যাসেল মহা সমস্যায় পড়ে গেল।

উইচিটা থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে হোটেল শেরাটনে উঠেছে ওরা। চারটে হোটেলে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর শেরাটনে তিন-তলায় একটা ডাবল রুম পাওয়া গেল, অন্যগুলোয় দশ তলার নিচে কোনো রুম খালি নেই। এলিভেটর-ভীতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি লিলি, রানাকে সে জানালো তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভাঙতে তার কোনো অসুবিধে হবে না।

আজ সকালে একবার বেরিয়েছিল ওরা, টুকটাক কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়েছে। তারপর প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুমোবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিছানায় ছিলো। ঘুম হয়নি, সেজন্যে পরস্পরকে দোষারোপ করেছে ওরা।

সন্ধ্যের পর আবার বেরিয়েছে, ডিনার খেয়ে তারপর ফিরবে হোটেলে।

ন'টা পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করলো ওরা। কখনো ট্যাক্সি নিলো, কখনো হাত ধরাধরি করে পার্কের ভেতর হাঁটলো। মাঝখানে দু'বার দুটো বারে ঢুকে বিয়ার খেলো। আর্ট গ্যালারি আর সিটি মিউজিয়ামেও ঢুঁ মারলো একবার করে। রানা কিছু বলেনি, তবে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না লিলির—রানা আসলে

পরীক্ষা করছে পিছনে কেউ আছে কিনা।

ন'টায় হ্যাপি ম্যান-এ ঢুকলো ওরা। নামকরা অভিজাত বার আর রেস্তোরাঁ। ঠিক সময়ে এসেছে ওরা, টেবিলগুলো প্রায় খালি পেলো। সন্ধ্যে থেকে আটটা সাড়ে-আটটা পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় থাকে। ধীরেসুস্থে ডিনার খেলো ওরা। দশটার দিকে গরম আবহাওয়ায় বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এফ. বি. আই.-এর কাউকে চেনো নাকি?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামালো লিলি। 'না। কেন?'

রাস্তার বাঁক পর্যন্ত হেঁটে এলো ওরা, রাস্তার ওপারে সারি সারি আলোকিত কনসার্ট আর থিয়েটার হল। ব্রডওয়ের দিকে এগোলো দু'জন। আধাআধি রাস্তা পেরিয়ে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসের সামনে একবার থামলো রানা, মাথা নাড়লো। 'আসলে ঠিক এফ. বি. আই. টাইপের এজেন্টকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, আমাদের দরকার একজন অসৎ পুলিশ। লোভী, কিন্তু খুব বেশি চতুর নয়। রাস্তায় টহল দেয় না, অফিসে বসে কাজ করে।'

'আজ সকালে বুঝি সে-নির্দেশই পেয়েছো রেডিওতে?'

'ওদের তো বলার কথা একটাই, তাড়াতাড়ি করো। ডিকোডিং করার সময় তোমাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু মনে করোনি তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আসলে···।'

'নিয়ম নিয়মই, জানি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো লিলি।

'ঠিক।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'কেন একজন অসৎ পুলিশ দরকার আমাদের? কারণ ম্যানিয়াক-টাকে খুঁজে বের করতে হলে বড় ধরনের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের

সাহায্য নিতে হবে। কাউকে খুঁজে বের করতে পুলিশ বিভাগের জুড়ি নেই। সংখ্যায় ওরা কয়েক লাখ, তাই না? তাছাড়া, পুলিশ বিভাগের সাথে এফ. বি. আই.-এরও যোগাযোগ আছে। এফ. বি. আই. টেলিপ্রিন্টার নেটওয়র্ক পুলিশ বিভাগও ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ ভালো একজন অসৎ পুলিশ সাহায্য করলে আমরা আসলে গোটা পুলিশ বিভাগ আর এফ. বি. আই.-এরও সাহায্য পাবো। আমাদের হয়ে কয়েক লাখ চোখ ডালচিমস্কিকে খুঁজতে শুরু করবে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বললো লিলি। 'কিন্তু বিপদের দিকটা ভেবে দেখেছো? ওদের টেলিপ্রিন্টার সার্কিটের মাধ্যমে সারা দেশে ডালচিমস্কির ফটো প্রচার করতে চাইছো তুমি, তাই না?'

চিন্তিতভাবে লিলির দিকে তাকালো রানা। ধীর পায়ে কলম্বাস সার্কেলের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

'গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে আমাকে জানানো হয়নি,' বললো লিলি। 'তবে ধারণা করি, ডালচিমস্কি বিপজ্জনক লোক, এবং তার কাছে মহামূল্যবান কিছু রয়েছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তুনি-য়ার সবাইকে তার কথা জানিয়ে দেয়ার ঝুঁকি কিভাবে তুমি নিতে চাও? অসৎ পুলিশ সন্দেহ করবে না, কেন তুমি এই লোককে খুঁজছো?'

মাথা নাড়লো রানা। 'সেজন্যেই তো বললাম, লোভী হোক, কিন্তু খুব বেশি চতুর হলে চলবে না। ভালো অর্থে আমি বোঝাতে চেয়েছি, অসৎ হলেও চুক্তি মেনে চলে। বেশি দর হাঁকতে পারে, কিন্তু সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয় না। তবে এ-কথা ঠিক যে এ-ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত।'

'আর খুঁজে যদি পাও-ও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে কিছু টাকাই শুধু

গচ্চা গেছে, কাজ কিছুই হয়নি। আমার তো মনে হচ্ছে এভাবে এগোলে অ্যাসাইনমেন্টটাও কেঁচে যেতে পারে।'

ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরোবার জন্যে কয়েক পা এগোলো রানা, তারপর কি মনে করে পিছিয়ে এসে আবার ফুটপাথে উঠলো।

'পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'এখন পর্যন্ত শূন্য,' হাসি চেপে বললো রানা। 'কেউ আমাদের ফলো করছে না।'

'একটু যেন নিরাশ হয়েছো?'

উত্তর না দিয়ে লিলির কাঁধ ধরলো রানা, কাছে টেনে চুমো খেলো ঠোঁটে।

'এ-সব কি!' অবাক হলো লিলি।

'বেহায়ার মতো কিছু না করলে লোকে আমাদের আমেরিকান না-ও ভাবতে পারে,' নিচু গলায় বললো রানা। 'নিরাশ, লিলি? না, এখনো হইনি। এই, শোনো, আমার একটা কাজ আছে—ঘণ্টাখানেক পর ফিরবো। তুমি রেস্তোরাঁয় ফিরে যাও, আমার জন্যে অপেক্ষা করো ওখানে।'

'কি কাজ? কি বলছো? কোন্ রেস্তোরাঁয় ফিরবো?'

'আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁয়,' বললো রানা। 'শেরাটনের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ওখানে।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তুমি?'

'বললাম না, একটা কাজ আছে।' খালি একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুললো রানা। 'কি কাজ পরে শুনো। এখন যাও তো। কি বলেছি মনে আছে?'

ম্লান চেহারা নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়লো লিলি। 'সাবধানে থেকো,' বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদের সামনে থামলো রানা। ভেতরে ঢুকে খুচরো পয়সা বের করলো পকেট থেকে। ডায়াল করলো ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে।

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ডিসি-এইট কাল সকাল সোয়া এগারোটায় টেক-অফ করবে। নন-স্টপ ফ্লাইট, লাস ভেগাসে পৌঁছুতে সময় নেবে পাঁচ ঘণ্টা। প্রতিটি ফার্স্ট ক্লাস টিকেটের দাম পাঁচশো সতেরো ডলার। ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় আপনমনে হাসলো রানা—যার কাঁধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার ইকোনমি বা সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করা সাজে না।

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো রানা। এক ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরবে ও, কিন্তু হাতে কোনো কাজ নেই।

রানা জানে না, ঠিক ওই সময় অন্য এক শহরে পরবর্তী টার্গেটের কথা ভাবছে ডালচিমস্কি।

রানা আরো জানে না, আবার তাকে খুন করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে অপেক্ষা করছে গ্রু-র তৃতীয় দলটা। তারা এই ভেবে পুলকিত যে আজ মাসুদ রানার রক্ষা নেই। এবারের ফাঁদে পা তাকে দিতেই হবে।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য।)

সেবা
প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন এই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক, বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনা-মূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

ওয়েস্টার্ন-৪৫

বাথান-২

রচনাঃ রওশন জামিল

বিষয়ঃ রহস্যের জট খুলে এনেছে কর্টেয, এসময় ওকেই ফাঁসিয়ে দিল শত্রুপক্ষ। লোকজন খুঁজছে ওকে…

মাসুদ রানা-১৪৯

দুইখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

শান্তিদূত-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

একশো ছত্রিশজন ডীপ কাভার রাশান এজেন্ট
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে।
তারা জানেও না যে তারা বিদেশী এজেন্ট,
সম্মোহনের মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে সব।

যদি কখনও চরম সঙ্কট দেখা দেয়
টেলিফোনের মাধ্যমে ওদের একটা কোডেড মেসেজ দি
ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠবে একেকজন—
মেতে উঠবে মারাত্মক ধ্বংসলীলায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে,
দুই পরাশক্তিই সদ্ভাব বজায় রেখে
পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
আশাবাদী হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী।

এমনি সময়ে টেলিফোন আসতে শুরু করলো
একের পর এক ডীপ কাভার এজেন্টের কাছে।
এ নিশ্চয়ই উন্মাদ ডালচিমস্কির কাজ!

বিশ টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০